ককবরক ও বাংলা

একটি তুলনামূলক আলোচনা

অধ্যাপক প্রভাসচন্দ্র ধর

উপজাতি গবেষণা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র
ত্রিপুরা সরকার ■ আগরতলা

ককবরক ও বাংলা
একটি তুলনামূলক আলোচনা

অধ্যাপক প্রভাসচন্দ্র ধর

এম.এ.এম.লিট, পিএইচ.ডি

অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক, মহারাজা বীরবিক্রম মহাবিদ্যালয়,

আগরতলা, ত্রিপুরা

উপজাতি গবেষণা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র,

ত্রিপুরা সরকার।

ককবরক ও বাংলা
একটি তুলনামূলক আলোচনা

প্রকাশক ঃ
উপজাতি গবেষণা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র
ত্রিপুরা সরকার, আগরতলা।

প্রথম প্রকাশ ঃ মার্চ, ২০১৭ইং

প্রচ্ছদ অলংকরণ ঃ সমর সেন

মূদ্রণ ঃ কালিকা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড।
আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম।

ISBN - 978-81-932589-3-4

মূল্য ঃ ৮০ টাকা

ভূমিকা

বাল্যকালে বিভিন্ন লোকের মুখে বিভিন্ন প্রকার বাংলা উচ্চারণ শুনে আমার ও আমার সমবয়সীদের মধ্যে বড়ই কৌতুক ও কৌতুহলের উদ্রেক হতো। ওদের উচ্চারণ আমাদের থেকে ভিন্ন বলে আমাদের কৌতুক হতো। আবার ওদের উচ্চারণ আমাদের থেকে ভিন্ন কেন তা জানবার জন্য কৌতুহলও হতো। আমাদের গ্রামে একটি জমিদার বাড়ি ছিল। ঐ বাড়ি পাহারা দেওয়ার জন্য দুইজন নেপালী দারোয়ান ছিল। বিকালে আমরা ওদের কাছে বসে গল্প শুনতাম। ওদের ব্যত্যয়ী বাংলা উচ্চারণ এবং মাঝে মাঝেই বড় বড় শব্দের ব্যবহার আমাদিগের মধ্যে যুগগৎ কৌতুকের আনন্দ ও কৌতুহলের বিস্ময়ের উদ্রেক করতো। মাঝে মাঝে আমার বন্ধু তাহের আলীর বাড়িতে তার চাচা মীরবক্স চৌধুরী আসতেন সিলেটের মৌলভীবাজার থেকে, আমার শচীন্দ্র দাদা আসতেন নোয়াখালী থেকে। এদের কথা শুনতে আমাদের খুব মজা লাগতো। ভাবতাম এমন কেন হয়! সিরাজ উদ্দৌলা নাটকে সাহেবের বাংলাও আমার কাছে বড় অদ্ভূত লাগতো।

১৯৭৫-৭৭ সালে হায়দরাবাদে সেন্ট্রাল ইনষ্টিটিউট্ অব ইংলিশ এন্ড ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজেস্এ (বর্তমান নাম 'ইংলিশ ইউনিভার্সিটি'।) গবেষণা কাজে নিযুক্ত ছিলাম। সেখানে কাজ করার সময় মানুষের ভাষাকে ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে দেখার শিক্ষা লাভ হয়। সেখানে বসেই মনে আকাঙ্খা জাগে ত্রিপুরার ককবরক ভাষাটি নিয়ে কিছু করার। ১৯৭৭এ আগরতলায় ফিরে এসে ককবরক শিখি ও ভাষাটির অন্তর্নিহিত নিয়মাবলীগুলিকে একটি লিখিত ব্যাকরণের রূপ দিতে চেষ্টা করি। এই চেষ্টা 'ককবরক সৌরীঙমা' নামের একটি পুস্তকে রূপ লাভ করে। এইটিই ককবরকের ভাষাতত্ত্বভিত্তিক প্রথম ব্যাকরণ। ত্রিপুরা সরকারের গবেষণা অধিকার ১৯৮৩ সালে ঐ পুস্তকটি প্রকাশ করে।

১৯৮২ সালে মহীশূর নগরে অনুষ্ঠিত 'দক্ষিণ এশিয় ভাষা ও ভাষাতত্ত্বের তৃতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন থেকে আরম্ভ করে ১৯৮৮ সালে আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত ভারতীয় ভাষাতাত্ত্বিক সমিতির বার্ষিক সম্মেলন পর্যন্ত অনেক বিদ্বৎ সমাজে ককবরকের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছি ও বিদ্বজ্জনের পরামর্শ ও উপদেশ লাভ করেছি। ইতিমধ্যে ককবরক-বাংলা-ইংরেজী একটি ত্রিভাষিক অভিধান সম্পাদনা করেছি। এইটি ১৯৮৭ সালে ত্রিপুরা

সরকারের 'উপজাতি গবেষণা সংস্থান' দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে। আমার ভাগ্যবিধাতার অপরিমিত করুণার ফলে 'ককবরকের জন্য আমার কিছু করার আকঙ্খা' বাংলা কৃত্তিবাসী রামায়ণের ককবরকে অনুবাদ করার প্রচেষ্টা রূপে আরম্ভ হয় ১৯৮২ সালে। বিশাল গ্রন্থ। ছত্রিশ হাজার ছন্দোবদ্ধ ছত্র। ১৯৮২ থেকে ১৯৯৭, এই পনেরো / ষোল বছর ধরে বিধাতা আমার ধৈর্য ও তিতিক্ষা সঞ্জীবিত রেখেছেন ও এত দীর্ঘকাল ধরে আমার শত শত (মহারাজ বীর বিক্রম কলেজের) ককবরক ভাষী ছাত্র-ছাত্রীকে প্রেরণা জুগিয়েছেন মহা উৎসাহে আমার প্রয়োজন ও অনুরোধ মত বাংলা শব্দের ককবরক প্রতিশব্দ জোগাড় করে সরবরাহ করে যেতে। ছন্দোবদ্ধ কৃত্তিবাসী রামায়ণ ষোল বছরের প্রায়-অসম্ভব তপস্যায় ককবরক 'রামায়ন প্রভাসচন্দ্রনী'তে নব কলেবর লাভ করে ও মাতা ককবরক একটি মহাকাব্য লাভ করে আরও গৌরবান্বিত হয়ে উঠেন। এইভাবে 'ককবরকের জন্য সত্যিকারের' কিছু করতে পেরে আমার পরম সন্তুষ্টি লাভ হয়। এই বিষয়ে আমার অগণিত ছাত্র-ছাত্রীগণ সহ যাঁরা আমাকে অকৃপণভাবে সাহায্য করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি আমি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

'বাংলা ও ককবরক-একটি তুলনামূলক আলোচনা' শীর্ষক গবেষণা পত্র (থিসিস)টির জন্য ১৯৯৩ সালে আমার পিএইচ.ডি ডিগ্রী লাভ হয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তারপর থেকে আমার প্রতি সদা প্রসন্ন বিদ্যার দেবী আমার দ্বারা অনেক সাহিত্য কর্ম করিয়ে নিচ্ছেন। অধিকাংশই বাংলায়, কিছু ইংরেজীতে ও অল্প ককবরকে। কিছুদিন ধরে আমার মনে হচ্ছে যে আমার থিসিসটি গত পঁচিশ বছরের অভিজ্ঞতা ও ভাষার বিবর্তনের আলোকে পরিবর্জন, পরিমার্জন ও পরিযোজন করে প্রকাশ করা প্রয়োজন। এটি অনুসন্ধিৎসু পাঠক ও গবেষকদের প্রয়োজন মেটাবে আমার চলে যাওয়ার পরেও বহুকাল ধরে। সুতরাং এইটিতে প্রয়োজনীয় সংস্কার করে এটিকে কালোপযোগী করে নিয়েছি। প্রকাশিত হলে এই ক্ষুদ্র পুস্তকটি ভাষা গবেষণার ইতিহাসে একটি মাইলষ্টোন হয়ে থাকবে। উল্লেখ থাকে এই যে এই পুস্তকে দেওয়া তথ্য ও মতামত বিংশ শতাব্দীর নবম দশকের।

অধ্যাপক প্রভাসচন্দ্র ধর

প্রাক কথন

অধ্যাপক প্রভাস চন্দ্র ধর প্রনীত 'ককবরক ও বাংলা ঃ একটি তুলনা মূলক আলোচনা' পুস্তকটি ককবরক ভাষা শেখার জন্য আবশ্যিক প্রথম পাঠ বলে বিবেচিত হবে।

কক শব্দের অর্থ হল ভাষা এবং বরক মানে মানুষ। ককবরক হল মানুষের ভাষা। মূলত: ত্রিপুরার জনজাতিরা এ ভাষায় কথা বলেন। বিগত কয়েক দশক ধরে ককবরকে কথাসাহিত্য এবং অন্যান্য সাহিত্য সৃষ্টির কাজ চলছে।

ত্রিপুরার স্কুল কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠসূচীতে ককবরক গৃহীত হয়েছে। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃত এবং পাঠ্যক্রমে ককবরককে অন্তর্ভূক্ত করার পশ্চাতে অনেক ভাষাবিদ এবং পণ্ডিত ব্যক্তিদের অবদান রয়েছে। শুরুতে ককবরক ভাষার কোন লিখিত ব্যাকরণ ছিল না। ছিলনা এ ভাষাতে অনুবাদিত ভারতীয় পৌরাণিক ঐতিহ্যমণ্ডিত পুস্তকাবলী। ককবরক ভাষার বুনিয়াদ নির্মাণের কাজ এখনও চলছে। অনেকের সাথে এ কাজটি যিনি অদম্য নিষ্ঠার সংগে নিরলস ভাবে করে চলেছেন — তিনি অধ্যাপক প্রভাসচন্দ্র ধর। ককবরককে ভালবেসে তিনি লিখেছেন 'ককবরক সৌরীঙমা' — ককবরকের ভাষাতত্ব ভিত্তিক প্রথম ব্যাকরণ। কৃত্তিবাসী রামায়ণের তিনি অনুবাদ করেছেন ককবরকে। কাজটি বিশাল, তাতে রয়েছে ছত্রিশহাজার ছন্দোবদ্ধ ছত্র।

বাংলাভাষা আজকের দিনে অনেক বেশি সম্বৃদ্ধ এবং সম্পদশালিনী বলে মনে হয়। অষ্টাদশ শতকে বাংলা ভাষা আজকের ককবরক ভাষার চেয়ে কোন অংশে বেশি উন্নত এবং গরীয়সী ছিল না। ইংল্যাণ্ড থেকে ইংরেজী ভাষী উইলিয়াম কেরি এসে প্রথম বাংলা ব্যাকরণ, অভিধান ও বহুভাষিক শব্দকোষ প্রণয়ন করেন। তাতে বাংলাভাষা সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপিত হয়। পরবর্তী সময়ে অনেক বিদগ্ধ ব্যক্তিদের অবদানে বাংলাভাষা ঋদ্ধ এবং সুষমামণ্ডিত হয়েছে। গবেষকদের মতে, উইলিয়াম কেরি হলেন বাংলা গদ্যসাহিত্যের জনক।

বাংলা ভাষার জন্য সেই সময়ে উইলিয়াম কেরি যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, এই এখন প্রভাসচন্দ্র ধর ককবরক ভাষার জন্য সেই কাজটি সুচারুভাবে সম্পন্ন করার কাজে ব্রত হয়েছেন।

এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না বলে মনে হয়, বাংলা ভাষার জন্য যেমন ইউলিয়াম কেরি, তেমনি ককবরকের জন্য প্রভাসচন্দ্র ধর। বস্তুতঃ প্রভাসচন্দ্র ধর হলেন আমাদের ইউলিয়াম কেরি।

আগরতলা,
২৮ শে জুলাই, ২০১৬

অরুণোদয় সাহা
প্রথম উপাচার্য
ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়

মুখবন্ধ

তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এতে গবেষক দুই বা ততোধিক ভাষা নিয়ে তাদের ধ্বনিতত্ত্ব, শব্দতত্ত্ব, ব্যাকরণ ইত্যাদি বিভিন্ন স্তর নিয়ে আলোচনা করে ভাষাগুলির বৈশিষ্ঠ্য তুলে ধরেন। এই গবেষণার ফল স্বরূপ যে রচনা প্রস্তুত হয় তাতে বিভিন্ন স্তরে ভাষাগুলির নৈকট্য ও দূরত্ব সম্বন্ধে বিশদ জ্ঞান হয়। এর ফলে ভাষাভাষীদের পরস্পরের ভাষা শিখতে ও শিখাতে বিশেষ সুবিধা হয়। বর্তমান পুস্তকটি সেই শিক্ষার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারবে বলে আশা করা যায়। অধ্যাপক প্রভাসচন্দ্র ধর ককবরক ভাষা ও সাহিত্যের ভান্ডারে ইতিমধ্যেই মূল্যবান সব সম্পদ রেখেছেন। তাঁর 'ককবরক সৌরীঙমা' ককবরক শিক্ষার ক্ষেত্রে পথিকৃৎ হয়ে আছে। 'রামায়ন প্রভাসচন্দ্রনি' ককবরককে একটি মহাকাব্য ধারণের গৌরব প্রদান করেছে। তিনি 'কক কুথুমমা' নামের একটি 'ককবরক-বাংলা-ইংলিশ অভিধানও সম্পাদনা করেছেন। আমাদের আশা 'ককবরক ও বাংলা একটি তুলনামূলক আলোচনা' নামের এই পুস্তকটি ত্রিপুরার ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি দূরত্ব সূচক প্রস্তর ফলক হয়ে থাকবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে।

পুস্তকটি শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের উপকারে আসলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক বলে মনে করবো।

সুনীল দেববর্মা
অধিকর্তা
উপজাতি গবেষণা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র,
ত্রিপুরা সরকার।

আগরতলা,
১লা মার্চ, ২০১৭ ইং

সূচীপত্র

	(১) অবতরণিকা	**পৃ: ১-৭**
১.১	বাংলা - অবস্থান ও বক্তা	
১.২	ককবরক - অবস্থান ও বক্তা	
১.২.১	ককবরক- নাম ও নামের বুৎপত্তি	
১.২.২	ককবরক - বর্তমান অবস্থা	
১.৩	উপভাষা	
১.৪	বাংলা ভাষা নিয়ে গবেষণার ইতিবৃত্ত	
১.৫	ককবরক নিয়ে গবেষণার ইতিবৃত্ত	
১.৬	বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য	
১.৭	লিপি	
১.৮	অধ্যায় সমূহ	
	(২) ধ্বনি -তত্ত্ব	**পৃ: ৮-২৩**
২.০	ভাষা ও ধ্বনিগুচ্ছ	
২.১	স্বরধ্বনি	
২.১.১	বাংলা মৌলিক স্বরধ্বনি	
২.১.২	ককবরক মৌলিক স্বরধ্বনি	
২.১.৩	বাংলা ও ককবরক মৌলিক স্বরধ্বনির তুলনামূলক আলোচনা	
২.১.৪	বাংলা যৌগিক স্বরধ্বনি	
২.১.৫	ককবরক যৌগিক স্বরধ্বনি	
২.১.৬	স্বরধ্বনির সানুনাসিকতা	
২.২	ব্যঞ্জন ধ্বনি	
২.২.১	বাংলা ব্যঞ্জন ধ্বনি	
২.২.২	ককবরক ব্যঞ্জন ধ্বনি	
২.২.৩	বাংলা ও ককবরক ব্যঞ্জন ধ্বনির তুলনামূলক আলোচনা	
২.৩	প্রস্বর প্রক্রিয়া	
২.৪	স্বন	
২.৫	উচ্চারণ	

২.৫.১ বাংলার লিখিত রূপ ও তার উচ্চারণ
২.৫.২ ককবরকের লিখিত রূপ ও তার উচ্চারণ

(৩) শব্দভান্ডার পৃ: ২৪-২৮

৩.১ বাংলা শব্দভান্ডার
৩.২ ককবরক শব্দভান্ডার
৩.৩ প্রত্যেক ভাষার অবশ্য প্রয়োজনীয় শব্দ
৩.৪ বাংলা শব্দভান্ডারের উৎস
৩.৫ ককবরক শব্দভান্ডারের উৎস
৩.৬ ককবরকে কি ধরণের শব্দ আছে
৩.৭ ককবরকে বাংলা শব্দের পরিমাণ

(৪) ব্যাকরণ পৃ: ২৯-৯৭

৪.০ ভূমিকা
৪.১ বিশেষ্য
৪.১.১ বিশেষ্যের গঠনগত শ্রেণীবিভাগ
৪.১.২ সিদ্ধ বিশেষ্য
৪.১.৩ সাধিত বিশেষ্য
৪.১.৩.১ ককবরক ব-বিশেষ্য
৪.২ লিঙ্গ
৪.২.১ লিঙ্গান্তর প্রণালী
৪.৩ বচন
৪.৩.১ বাংলায় বহুবচন ব্যবহারের নিয়মাবলী
৪.৩.২ ককবরকে বহুবচন ব্যবহারের নিয়মাবলী
৪.৪ পদাশ্রিত নির্দেশক
৪.৪.১ বাংলা পদাশ্রিত নির্দেশক
৪.৪.২ ককবরক পদাশ্রিত নির্দেশক
৪.৫ কারক ও বিভক্তি
৪.৫.১ বাংলা কারক
৪.৫.২ ককবরক কারক
৪.৫.৩ বাংলা ও ককবরক বিভক্তি চিহ্ন
৪.৫.৪ শব্দরূপ। মানুষ-বরক শব্দের রূপ
৪.৬ বিশেষণ
৪.৬.১ বিশেষণের শ্রেণী বিভাগ
৪.৬.১.১ ককবরক ক-বিশেষণ
৪.৬.২ বিশেষণের বচন ও লিঙ্গান্তর
৪.৬.৩ তুলনামূলক বিশেষণ
৪.৭ সংখ্যা
৪.৭.১ বাংলা গণনা পদ্ধতি
৪.৭.২ ককবরক গণনা পদ্ধতি
৪.৮ সর্বনাম
৪.৮.১ বাংলা ও ককবরক সর্বনাম
৪.৮.২ ককবরক সর্বনামের কিছু বৈশিষ্ট্য
৪.৮.৩ সর্বনামে বহুবচন চিহ্ন - বাংলা
৪.৮.৪ সর্বনামে বহুবচন চিহ্ন- ককবরক
৪.৮.৫ শব্দরূপ। 'আমি' শব্দের রূপ
৪.৮.৬ 'আঙ' শব্দের রূপ
৪.৮.৭ বাংলা সর্বনামজাত বিশেষণ
৪.৮.৮ ককবরক সর্বনামজাত বিশেষণ
৪.৯ অব্যয় ও অব্যয়স্থানীয় পদ
৪.৯.১ বাংলা অব্যয়
৪.৯.২ ককবরক অব্যয়
৪.১০ ক্রিয়া
৪.১০.১ সিদ্ধ, সাধিত ও সংযোগমূলক ধাতু
৪.১০.২ সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়া
৪.১০.৩ ক্রিয়ার কাল
৪.১০.৩.১ বাংলায় ক্রিয়ার কাল
৪.১০.৩.২ ককবরকে ক্রিয়ার কাল
৪.১০.৩.৩ বাংলা ও ককবরক ক্রিয়ার কাল প্রকারের তুলনামূলক আলোচনা
৪.১০.৩.৪ ক্রিয়ার কাল চিহ্ন
৪.১০.৩.৫ ধাতুরূপ

৪.১০.৩.৬ সংক্ষেপে ককবরক কালচিহ্নগুলি
৪.১০.৪ ক্রিয়ার ভাব- প্রদর্শক প্রকার
৪.১১ শব্দ গঠন
৪.১১.১ শব্দগঠনের প্রধান দুটি পদ্ধতি
৪.১১.১.১ প্রত্যয়
৪.১১.১.২ বাংলা কৃৎ প্রত্যয়
৪.১১.১.৩ ককবরক কৃৎ প্রত্যয়
৪.১১.১.৪ বাংলা ও ককবরক তদ্ধিত প্রত্যয়
৪.১১.২ সমাস
৪.১১.২.১ সংযোগমূলক সমাস
৪.১১.২.২ ব্যাখ্যান মূলক সমাস
৪.১১.২.৩ বর্ণনামূলক সমাস
৪.১২ বাক্যরীতি
৪.১২.১ পদক্রম
৪.১২.২ বাক্যের গঠনগত শ্রেণী বিভাগ
৪.১২.২.১ সরল বাক্য
৪.১২.২.২ জটিল বাক্য
৪.১২.২.৩ যৌগিক বাক্য
৪.১২.৩ বাক্যের অর্থগত শ্রেণী বিভাগ
৪.১২.৩.১ উক্তিমূলক বাক্য
৪.১২.৩.১.১না-বোধক করার নিয়ম
৪.১২.৩.২ জিজ্ঞাসা সূচক বাক্য
৪.১২.৩.২.১ক-প্রশ্ন
৪.১২.৩.২.২অন্য প্রশ্ন
৪.১২.৩.৩ আজ্ঞাসূচক বাক্য
৪.১২.৩.৪ আবেগসূচক বাক্য
উপসংহার পৃ: ৯৮
পরিশিষ্ঠ পৃ: ৯৯-১০০
গ্রন্থপঞ্জি পৃ:১০১-১০৩

(১) অবতরণিকা

১.১ বাংলা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর ভারতীয় শাখার একটি আধুনিক ভাষা। সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলার সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ট। প্রধানতঃ বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম, মেঘালয়, মনিপুর, বিহার, উড়িষ্যা ও আন্দামানে বাংলাভাষীরা বাস করে। তাছাড়াও ভারতের ভিতরে ও ভারতের বাইরে পৃথিবীর বহু অঞ্চলে বাস করে বহু বাংলাভাষী। তাদের মোট সংখ্যা বেশ কয়েক কোটি। বক্তার সংখ্যা বিচারে পৃথিবীর ভাষা সমাজে বাংলার স্থান নবম। মান্দারিন চৈনিক, ইংরেজী, হিন্দী-উর্দু, স্পেনীয়, রুশ, জার্মান, জাপানী ও আরবীর পরেই বাংলা (West, 1975:43)। ১৯০৩ সালে প্রকাশিত গ্রীয়ার্সনের লিঙ্গুয়িষ্টিক সার্ভে অব ইন্ডিয়া' অনুসারে সেই সময়ের বাংলাভাষীর সংখ্যা ৬, ৭২,৩৬,৩৬৪ জন (Grierson, 1903, Vol-V, Part-I, P-19)। বাংলার একটি সমৃদ্ধ সাহিত্য আছে। ১৯৪৯ সালে ত্রিপুরা রাজ্য স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারতের অঙ্গীভূত হয়। তার আগে প্রায় পাঁচ শো বছর ধরে বাংলা ত্রিপুরা রাজ্যের রাজভাষা এবং সরকারী ভাষা ছিল।

১.২ ককবরক ইন্দো-চৈনিক ভাষা গোষ্ঠীর তিব্বত-বর্মী শাখার বড়ো উপশাখার একটি ভাষা। গ্রীয়ার্সনের 'লিঙ্গুয়িষ্টিক সার্ভে অব ইন্ডিয়া' অনুসারে সেই সময়ের ককবরক ভাষীর সংখ্যা১,০৫,৮৫০ জন (Grierson, 1903,Vol-III, Part-II, P-109)। বর্তমানে ককবরক ভাষীর মোট সংখ্যা পাঁচ লক্ষের মত। ককবরক ভাষীরা প্রধানতঃ ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের অধিবাসী। ত্রিপুরার বাইরে বসবাসকারী ককবরক ভাষীর সংখ্যা নগন্য। পরের পৃষ্ঠায় ইন্দোচৈনিক ভাষাগোষ্ঠীর একটি নির্লেখ দেওয়া হলো। (তালিকা-১)। এতে এই ভাষাগোষ্ঠীতে ককবরকের অবস্থান দেখা যাবে।

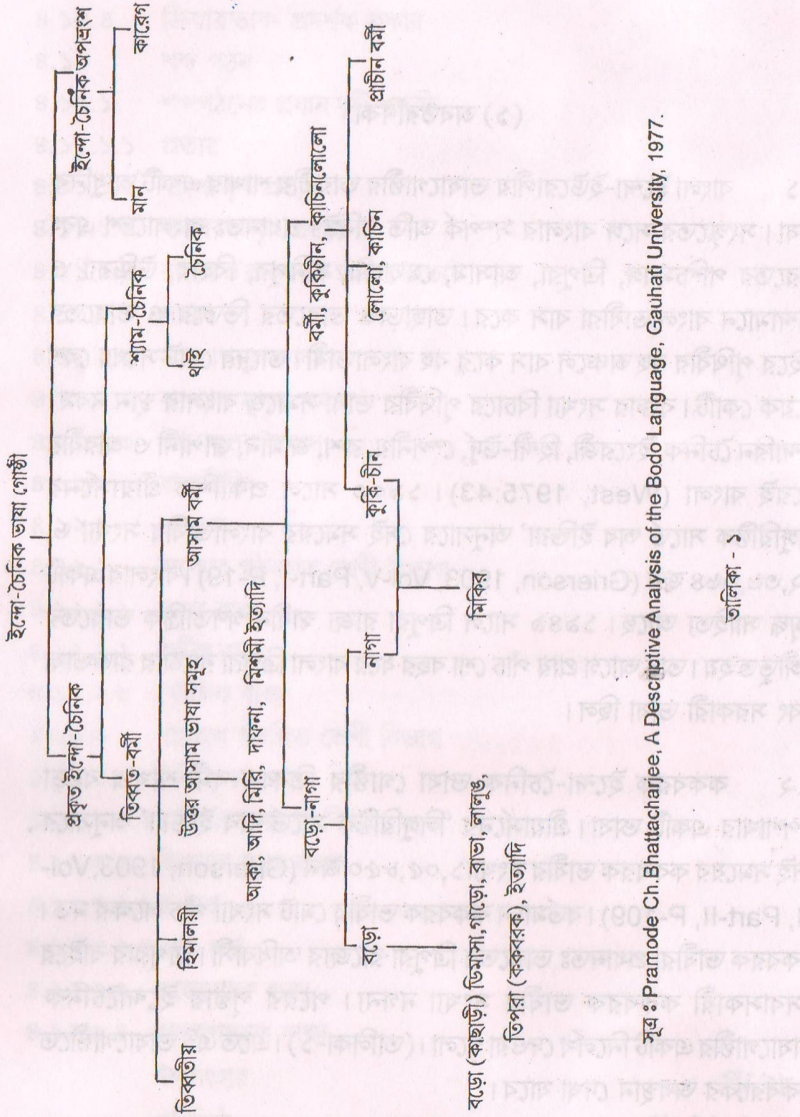

সূত্র ঃ Pramode Ch.Bhattacharjee, A Descriptive Analysis of the Bodo Language, Gauhati University, 1977.

তালিকা - ১

১৯৮১ সালের লোকগণনার একটি প্রতিবেদনে (Chakrabarty, 1988 : 38-50) ত্রিপুরার অধিবাসীদের মধ্যে যারা ভারতের সংবিধানের অষ্টম তপশীলে অন্তর্ভুক্ত ভাষাগুলি ছাড়া অন্য কোনও ভাষায় বাড়ীতে কথা বলে তাদের একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে। ঐ তালিকার তথ্য নীচে দেওয়া হলো।

ভাষার নাম		বক্তার সংখ্যা
আনাল	ঃঃ	২
ইংরেজী	ঃঃ	১২
ওরাওঁ / কুরুখ	ঃঃ	২,৮২০
কিন্নরী	ঃঃ	৯
কুকি	ঃঃ	১,১৭৮
কোন্ধনী	ঃঃ	৯
কোচ	ঃঃ	২৫৫
কোন্ডা	ঃঃ	২০৩
খারিয়া	ঃঃ	২৯৮
খাসী	ঃঃ	৪৪০
গারো	ঃঃ	৬,৯০১
গোন্ডী	ঃঃ	২৫৪
ছাঙ	ঃঃ	৩
ডোগরী	ঃঃ	৯
ত্রিপুরী	ঃঃ	৪,৬৯,৯৯০
নাগা	ঃঃ	৩
নেপালী / গোর্খালী	ঃঃ	২,১৯০
ভাষার নাম		**বক্তার সংখ্যা**
ভিলি / ভিলোডি	ঃঃ	৪৮০
ভুটিয়া	ঃঃ	৯
ভূমিজ	ঃঃ	৩১
মগ	ঃঃ	১৬,৯১৭
মেইতেই / মণিপুরী	ঃঃ	১৭,৪৭৫

মারিঙ	ঃ	২
মাল্টো	ঃ	৬৪
মুন্ডা	ঃ	৪,৩১৫
মুন্ডারী	ঃ	৫১৫
রাভা	ঃ	১০
লুসাই / মিজো	ঃ	৪,১৮৪
সাঁওতালী	ঃ	১,০১২
সাভারা	ঃ	১,০৪২
হালাম	ঃ	১৮,৩১২
মোট	-	৫,৪৮,৯৩৬

তালিকা -২

এই তালিকার 'ত্রিপুরী' ভাষাটিই আমাদের ককবরক।

১.২.১ ত্রিপুরায় ১৯টি উপজাতির মানুষ বাস করে। এরমধ্যে উচই, কলই, জমাতিয়া, ত্রিপুরী, নোয়াতিয়া, রাংখল, রিয়াং ও রূপিনী — এই গোষ্ঠীগুলির ভাষাকে ককবরক বলা হয়। এই ভাষাটির অধিকাংশ বক্তা ত্রিপুরী বলে ভাষাটিকে 'ত্রিপুরী' বা অপভ্রংশ 'তিপরা' নামেও অভিহিত করা হত। কিন্তু প্রায় সকল বক্তাই 'ককবরক' নামটি ভালবাসেন বলে বর্তমান নিবন্ধে এই নামটি ব্যবহার করা হয়েছে।

'ককবরক' শব্দটির অর্থ করা হয় 'মানুষের ভাষা'। আমরা এই অর্থের সঙ্গে একমত নই। 'কক' শব্দের অর্থ 'কথা', 'ভাষা', ইত্যাদি। 'বরক' শব্দের অর্থ 'মানুষ'। এই জন্য ককবরক শব্দটির অর্থ করা হয়েছে 'মানুষের ভাষা'। এই অর্থটি সর্বদা গ্রহণ করা চলে না। কারণ এই ভাষায় 'বরক' শব্দটি অন্য বহু শব্দের অন্ত্যভাগ হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে। যেমন —

উা-বাঁশ; উাবরক- একটি বিশেষ শ্রেণীর বাঁশ।
কামচৌলাই -শার্ট, কামচৌলাই বরক - হাতে তৈরী শার্ট।
খাকলু - ছাঁচি কুমড়া; খাকলু বরক - জুমের কুমড়া।
উাক- শূকর; উাকবরক - পাহাড়ী মোটা শূকর।
খুল -তুলা; খুলবরক - জুমের তুলা।

নগ- ঘর; নগবরক - পাহাড়ে সাধারণত যে ধরণের দোচালা ঘর দেখা যায়।
মুই- ব্যঞ্জন; মুইবরক - পাহাড়ীদের রান্না করা তেলহীন ব্যঞ্জন।
তখা - কাক; তখাবরক - দাঁড় কাক।
সরকসা - শালিক; সরকসা বরক - পাহাড়ে গর্তে বাস করে যে শালিক।
দা- দা, কাটারি; দাবরক - পাহাড়ীরা যে ধরণের সোজা দা ব্যবহার করে।
রিগনায় - মেয়েদের কাপড়; রিগনাইবরক - নিজেদের তাঁতে তৈরী ঐ কাপড়।
রিতরাগ - বিছানার চাদর; রিতরাগবরক - নিজেদের তাঁতে তৈরী ঐ চাদর।

এই শব্দগুলির কোথাও 'বরক' শব্দের আক্ষরিক অর্থ 'মানুষ' নেওয়া হয়নি। তাই মনে হয় ককবরক এর ক্ষেত্রেও 'মানুষ' অর্থটি নেওয়া সঙ্গত নয়। উল্লিখিত শব্দগুলিতে 'বরক' শব্দের যে অর্থটি সাধারণভাবে ধরে নেওয়া যায় তা হলো 'আমাদের'। এই জন্য 'ককবরক' শব্দটির অর্থ হবে 'আমাদের ভাষা'।

১.২.২ ককবরক একটি অরণ্য-পর্বত বাসী সরল জনগোষ্ঠীর মুখের ভাষা। এই জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ পঞ্চাশ বছর আগেও প্রায় যাযাবর জীবন যাপন করতো। জঙ্গল কেটে পুড়িয়ে জুম চাষ করতো আর নতুন জুমের জায়গার খোঁজে চলে যেত স্থানান্তরে। এদের ঘর ছিল সাময়িক আবাস। সুতরাং লেখাপড়ার ব্যবস্থা প্রায় ছিলই না। লেখার ব্যবস্থা ছিল না ককবরক ভাষাটিরও । লেখাই ছিল না, সুতরাং সাহিত্য ছিল না কিছু লিখিতভাবে। কিন্তু ছিল নাচ, গান, পূজা, উৎসব, দেবতা, দেব-কথা, কাহিনী ইত্যাদি। সবই মৌখিক।

কিন্তু কয়েক দশক ধরে ককবরকে লেখা চলছে। ককবরক-ভাষীরা দ্রুত আসছে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখন এদেরকে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন বৃত্তিতে। সাহিত্যও আস্তে আস্তে সমৃদ্ধ হচ্ছে। অনুবাদ সাহিত্যের মধ্যে আছে খৃষ্টান মিশনারীদের করা রোমান অক্ষরে ছাপানো বাইবেলের নিউ টেষ্টামেন্টের অনুবাদ 'সৌমাই কৌতাল'। শ্রী নন্দ কুমার দেববর্মা অনুবাদ করেছেন শ্রীমদ্ভগবত গীতা, বর্তমান গবেষক অনুবাদ করছে কৃত্তিবাসী রামায়ন। (এটি ১৯৯৯ সালে পারুল প্রকাশনীর দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে)।

১.৩ বাংলায় অনেক উপভাষা (dialect) আছে। উপভাষাগুলি প্রধানতঃ অঞ্চল ভিত্তিক। তবে নদীয়া-শান্তিপুর অঞ্চলে কথিত উপভাষাটিকেই বাংলার মান্য বা প্রমাণ্য উপভাষা বলে ধরা হয়। এই উপভাষাটিই কালক্রমে standard

বাংলা হয়ে উঠেছে। বর্তমান গবেষণার জন্য বাংলার এই রূপটিই গ্রহণ করা হয়েছে।

ককবরকভাষীরা অতীতে স্থায়ীভাবে কোথাও বাস করতো না। তাদের সকলেরই বৃত্তি ছিল জুম কেন্দ্রিক। তাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারও তেমন ছিল না। সুতরাং সঙ্গত কারণেই ককবরকে স্থান-নির্ভর, বৃত্তি-নির্ভর বা শিক্ষানির্ভর কোনও উপভাষা গড়ে উঠেনি। কিন্তু বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীগুলি পৃথক জায়গায় বাস করতো। ফলে গোষ্ঠীগুলির মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ছিল অত্যন্ত সীমিত। বহুকাল দ্বীপবদ্ধ অবস্থায় থাকায় বিভিন্ন গোষ্ঠীর ভাষার মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। তাই বলা চলে যে ককবরকে গোষ্ঠী ভিত্তিক উপভাষা আছে। তবে ককবরকে কোনও মান্য উপভাষা গড়ে উঠেনি। তাই বর্তমান গবেষণার জন্য যে কোন একটি উপভাষাকে গ্রহণ করা যেত। এই নির্বাচনে সংখ্যার উপর গুরুত্ব দিয়ে বৃহত্তম গোষ্ঠী ত্রিপুরীদের কথিত উপভাষাটিকেই গ্রহণ করা হয়েছে।

১.৪ বাংলা ভাষা অধ্যয়ন, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ হয়ে আসছে আড়াই শো বছর ধরে। বাংলা ভাষাতত্ত্বের প্রথম মুদ্রিত পুস্তক মনো এল দ্য আসসুম্পসাঁস এর দ্বিভাষিক শব্দকোষ ও ব্যাকরণ। তারপর থেকে বহু গবেষক বাংলা ভাষার বিভিন্ন স্তর নিয়ে আলোচনা করেছেন ও করছেন। তাঁদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহন রায়, রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। বিদ্যাসাগর ভাষাতাত্ত্বিক হিসাবে পরিচিত নন। কিন্তু তাঁর 'বর্ণ পরিচয়' প্রথমভাগ এর বিজ্ঞাপনটি পড়লে তাঁকে বাংলা বর্ণমালা পূণবিন্যাসের পথিকৃৎ বলতেই হয়। ১১২ টি শব্দের এই বিজ্ঞাপনটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের একটি আদর্শ উদাহরণ। (বিদ্যাসাগর ঃ সংবৎ ১৯১২)

১.৫ তুলনামূলকভাবে ককবরকের জন্য কাজ কম হয়েছে। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে আগরতলার রাধামোহন ঠাকুর মহাশয় একটি সংস্কৃতানুগ ব্যাকরণ লেখেন ককবরকের। এরপর বহুকাল ধরে ককবরকের জন্য কোন উল্লেখযোগ্য কাজ হয়নি। ১৯৭৬ সালে মহীশূরের কেন্দ্রীয় ভারতীয় ভাষা সংস্থান শ্রীমতী পুষ্পা পাই (কারপুরকার) এর ইংরেজীতে লেখা 'ককবরক গ্রামার' বইটি প্রকাশ করেন। ১৯৮৩ খৃষ্টাব্দে শ্রী সন্তোষ চক্রবর্তী তাঁর গবেষণা গ্রন্থ 'এ ষ্টাডি অব তিপরা

ল্যাঙ্গুয়েজ' এর জন্য বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ ডি ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৮৩ সালেই ত্রিপুরা সরকারের গবেষণা অধিকার বর্তমান গবেষকের 'ককবরক সীরীঙমা' নামক ব্যাকরণ বইটি প্রকাশ করেন। ককবরকের আধুনিক ভাষাতত্ত্ব ভিত্তিক ব্যাকরণ রচনায় এটিই প্রথম ও এখন (২০১৫) অবধি একমাত্র প্রচেষ্টা।

১.৬ বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য বাংলা ও ককবরকের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যগুলি সনাক্ত করে নথীবদ্ধ করা। ভাষা দুটির বিভিন্ন স্তর নিয়ে আলোচনা, বিশ্লেষণ ও সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যগুলির বর্গীকরণ, ভাষাদুটির পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তারের পরিধি ও গভীরতা বিচার ও নথীবদ্ধ করে বর্তমান ও ভবিষ্যতের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও গবেষকের পথ সুগম করাও এর উদ্দেশ্য।

১.৭ ককবরক প্রধানতঃ বাংলা অক্ষরেই লেখা হচ্ছে (১৯৮৮)। এই ভাষার মূল শব্দগুলি লিখতে সবগুলি বাংলা অক্ষরের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু এই ভাষায় অন্যান্য ভাষার মতই, অন্যান্য ভাষা থেকে আগত শব্দের সংখ্যা অনেক। ঐগুলি লেখার জন্য বাংলার সব অক্ষরই প্রয়োজন হয়। মূল ককবরকে এমন একটি স্বরধ্বনিও এমন একটি ব্যঞ্জনধ্বনি আছে যেগুলি বাংলা অক্ষর দিয়ে লিখলে উচ্চারণ ঠিক না হতে পারে। এই জন্য এই দুটি ধ্বনি লিখতে বাংলা অক্ষর দিয়েই দুটি নতুন অক্ষর তৈরী হয়েছে - ঔ এবং ঊ। 'ধ্বনিতত্ত্ব অধ্যায়ে এদের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে ককবরক লিখতে বাংলা বর্ণমালার সব অক্ষর ও ঔ আর ঊ ব্যবহার করা হয়।

১.৮ বর্তমান গ্রন্থটিতে ধ্বনিতত্ত্ব, শব্দভান্ডার, ব্যাকরণ ও উপসংহার নামে অধ্যায় ভাগ রয়েছে। ধ্বনিতত্ত্ব ভাগটিকে অনেকেই ব্যাকরণ ভাগের মধ্যেই ধরেন, পৃথক ভাবে আলোচনা করেন না। কিন্তু বিষয়টা একটু টেকনিক্যাল বলে এটিকে পৃথক রেখেছি। এই গ্রন্থে রূপতত্ত্ব (morphology) নামে কোন পৃথক অধ্যায় নেই। তবে বিষয়টি উপেক্ষা করা হয়নি। রূপতত্ত্বের ব্যুৎপত্তিগত (derivational) ও বিভক্তি প্রত্যয়গত (inflectional) দিকগুলি দেখানো হয়েছে শব্দভান্ডার ও ব্যাকরণ অধ্যায়ের বিভিন্ন অংশে।

(২) ধ্বনি তত্ত্ব

২.০ মানুষের ভাষা কতকগুলি ধ্বনি শৃঙ্খলের সমষ্টি মাত্র। একজন সাধারন, সুস্থ, স্বাভাবিক মানুষ অসংখ্য ধ্বনি উচ্চারণ করতে পারে। হরবোলারা কত কিছুই উচ্চারণ করেন। কিন্তু মানুষের অসংখ্য ভাষার প্রত্যেকটিতেই অর্থ দ্যোতক ধ্বনির সংখ্যা সীমিত। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন যে মানুষের ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনির সংখ্যা পনের থেকে পঞ্চাশ পর্যন্ত হতে পারে। (চট্টোপাধ্যায় ঃ ১৯৭৪ - ৫৮) প্রত্যেকটি ভাষার ব্যবহৃত ধ্বনির সংখ্যা যেমন সীমিত তেমনি অর্থদ্যোতক ধ্বনিগুচ্ছ আলাদা। বাংলা ও সংস্কৃত অতি নিকট সম্পর্ক যুক্ত দু'টি ভাষা। কিন্তু এদের ধ্বনিগুচ্ছ আলাদা। তেমনি ককবরক ও বাংলার ধ্বনিগুচ্ছও আলাদা। এখানে ককবরক ও বাংলায় ব্যবহৃত অর্থদ্যোতক ধ্বনিগুলির পাশাপাশি আলোচনা দেওয়া হচ্ছে। এতে দেখা যাবে যে বাংলায় এমন ধ্বনি আছে যা ককবরকে নেই। আবার ককবরকেও এমন ধ্বনি আছে যা বাংলায় নেই।

২.১ স্বরধ্বনি

২.১.১ বাংলায় মৌলিক স্বরধ্বনি মোট সাতটি। এগুলি নীচের নির্লেখে দেখানো গেল।

	সম্মুখ-প্রসৃত	কেন্দ্রীয়-বিবৃত	পশ্চাৎ-বর্তুল
উচ্চ	ই	-	উ
উচ্চ-মধ্য	এ	-	ও
নিম্ন-মধ্য	অ্যা	-	অ
নিম্ন -		আ	-

২.১.২ ককবরক মৌলিক স্বরধ্বনি মোট সাতটি। এগুলি নীচের নির্লেখে দেখানো গেল।

	সম্মুখ-প্রসৃত	কেন্দ্রীয়-বিবৃত	পশ্চাৎ	
			বর্তুল	প্রসৃত
উচ্চ	ই		উ	ঔ
উচ্চ-মধ্য	এ		ও	
নিম্ন-মধ্য			অ	
নিম্ন		আ		

২.১.৩ বাংলা ও ককবরক মৌলিক স্বরধ্বনিগুলির আলোচনা করলে দেখা যায় -

(ক) উচ্চ-সম্মুখ-প্রসৃত /ই/; নিম্ন কেন্দ্রীয় বিবৃত / আ/; এবং উচ্চ-পশ্চাৎ-বর্তুল/উ/; এই স্বরধ্বনিগুলি বাংলা ও ককবরক দুটি ভাষাতেই আছে এবং এদের ব্যবহার দুটি ভাষাতেই একরকম।

(খ) বাংলায় উচ্চ-মধ্য-সম্মুখ-প্রসৃত / এ/ এবং নিম্ন-মধ্য-সম্মুখ /অ্যা/, এই দুইটি ধ্বনি আছে। কিন্তু ককবরকে কেবল উচ্চ-মধ্য সম্মুখ প্রসৃত / এ/ ধ্বনিটি আছে। তবে স্বাভাবিক কারণেই এই ধ্বনিটির উচ্চারণ স্থান বিস্তৃত। এটি উপরের/ এ/ থেকে নীচের /অ্যা/ এর স্থান পর্যন্ত যে কোন জায়গায় উচ্চারিত হতে পারে। তবে ধ্বনিটির সম্মুখ প্রসৃত গুণটি সর্বদা বজায় থাকে।

(গ) বাংলা ও ককবরক উভয় ভাষাতেই নিম্ন-মধ্য-পশ্চাৎ-বর্তুল/ অ/ এবং উচ্চ-মধ্য-পশ্চাৎ-বর্তুল/ও/ ধ্বনি দুটি আছে। তবে ককবরক বক্তাদের কথায় এই দুটি ধ্বনির পার্থক্য সব সময় থাকে না। মান্য (standard) বাংলার কথায়ও /অ/এর বদলে/ ও/এর ব্যবহার প্রায়শঃই শোনা যায়।

(ঘ) বাংলা বর্ণমালার প্রথম অক্ষরটি 'অ'। এটি নিম্ন-মধ্য-পশ্চাৎ-বর্তুল স্বরধ্বনিটি দ্যোতনা করে। অহমীয়া ও ওড়িয়া ভাষার বর্ণমালার প্রথম অক্ষরটিরও এই ধ্বনি। কিন্তু ভারত-বাংলাদেশ-পাকিস্তান নিয়ে গঠিত এই উপমহাদেশের সকল ইন্দো-য়ুরোপীয় ও দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষার বর্ণমালার প্রথম অক্ষরটি হ্রস্ব 'আ' বা

নিম্ন-কেন্দ্রীয়-বিবৃত/ আ/ ধ্বনিটির হ্রস্ব সংস্করণ। আমাদের মনে হয় ইন্দো-য়ুরোপীয় গোষ্ঠী বহির্ভূত বহু সংখ্যক ভাষার সঙ্গে দীর্ঘকালের সহাবস্থানের ফলেই অহমীয়া, বাংলা ও ওড়িয়া ভাষায় / অ/ স্বরধ্বনিটি এসেছে। এই ধ্বনিটি অন্য কোন বড় (major) ভারতীয় ভাষায় নেই। এই ধ্বনিটি এবং আরো কিছু বৈশিষ্ট্য আছে বলে বাংলা-অহমীয়া-ওড়িয়া ভাষাঞ্চলটিকে বাও (BAO) অঞ্চল নাম দেওয়া হয়েছে। এই ধ্বনিটি উপমহাদেশের অন্য কোন বড় ভাষায় নেই।

(ঙ) ককবরকের উচ্চ-পশ্চাৎ-প্রসৃত / ঔ/স্বরধ্বনিটি বাংলায় নেই। এটি কোন বড় ভারতীয় ভাষায় নেই।

২.১.৪ বাংলা যৌগিক স্বরধ্বনি

একটি মৌলিক স্বরধ্বনি দিয়ে উচ্চারণ শুরু করে অন্য একটি দিয়ে শেষ করলে দুটি মিলে একটি যৌগিক স্বরধ্বনি হয়। তবে যৌগিক স্বরধ্বনি দুই বা ততোধিক স্বরধ্বনি মিলেও হতে পারে। সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের (চট্টোপাধ্যায় - ১৯৩৯/৮৯ পৃঃ ৩৪) বাংলায় ২৫টি দ্বিসর, ৩১টি ত্রিস্বর ও কয়েকটি চতুঃস্বর যৌগিক স্বরধ্বনি দেখিয়েছেন। এগুলি নীচে দেখানো হল। এখানে কয়টি উদাহরণ দেওয়া হল।

(ক) দ্বিস্বর ধ্বনি

	ধ্বনি	এবং	উদাহরণ
(১)	ইয়ে	-	নিয়ে
(২)	ইয়া	-	উঠিয়া
(৩)	ইও	-	দিও
(৪)	ইউ	-	মিউমিউ
(৫)	এই	-	লেই, খেই
(৬)	এয়া	-	খেয়া

(৭)	এও	-	চেও
(৮)	এউ	-	কেউ
(৯)	অ্যায়	-	দ্যায়
(১০)	অ্যাও	-	ম্যাও
(১১)	আই	-	যাই
(১২)	আয়	-	যায়
(১৩)	আও	-	যাও
(১৪)	আউ	-	দাউ দাউ, লাউ
(১৫)	অয়	-	ছয়, নয়, হয়
(১৬)	অআ	-	হআ(হওয়া)
(১৭)	অও	-	হও
(১৮)	ওই, ঐ	-	কই, কৈ
(১৯)	ওয়	-	ধোয়
(২০)	ওআ	-	ধোয়া
(২১)	উই	-	উই, দুই
(২২)	ওউ	-	বউ, বৌ
(২৩)	উয়ে	-	দুয়ে দুয়ে (চার)
(২৪)	উও	-	কুয়ো

(খ) ত্রিস্বর ধ্বনি

(১)	ইয়েই	-	গিয়েই (দেখলাম)
(২)	ইয়েও	-	গিয়েও (পেলাম না)

(৩) আইয়ে - নাইয়ে খাইয়ে

(৪) আইও - খাইও, খাইও

(৫) অয়ই - হয়ই

(৬) অয়ও - হয়ও

(৭) ওয়াই - খোয়াই

(গ) চতুঃস্বর ধ্বনি। এগুলি সম্বন্ধে সুনীতিকুমার (চট্টোপাধ্যায় ১৯৩৯/৮৯ পৃ. ৩৫) বলেন যে 'এগুলিকে সব সময়ে সত্যকার মিশ্র বা যৌগিক স্বর বলা চলে না।

২.১.৫ ককবরক যৌগিক স্বরধ্বনিগুলি নিম্নরূপ ঃ

(ক) দ্বিস্বর ধ্বনি

(১)	ইঅ	-	সিঅ	-	ভিজে যাওয়া
(২)	ইআ	-	ফিআ	-	কিন্তু
(৩)	আঅ	-	চাঅ	-	খায়
(৪)	আই	-	নাই	-	দেখা
(৫)	আয়	-	চালগনায়	-	চালক
(৬)	অঅ	-	সঅ	-	টানে
(৭)	অই	-	সই	-	ঠিক
(৮)	অআ	-	অআনা	-	চিন্তা করা
(৯)	উঅ	-	সুঅ	-	ধোয়
(১০)	উই	-	আচুই	-	পিতামহ
(১১)	ঔঅ	-	রৌঅ	-	দেয়

(১২)	ঔই	-	কৌরৌই	-	নাই
(১৩)	ঔআ	-	বৌআ	-	দাঁত

(খ) ত্রিস্বর ধ্বনি

(১)	আইআ	-	নাইয়া	-	দেখে না
(২)	আইঅ	-	নাইঅ	-	দেখে
(৩)	অইয়া	-	সইয়া	-	টানে না
(৪)	অইয়	-	সইঅ	-	টানে
(৫)	উইয়া	-	সুইআ	-	ধোয় না
(৬)	আইআ	-	রাইয়া	-	দেয় না
(৭)	আইঅ	-	সাইঅ	-	লেখে

(গ) ককবরকে তিনের বেশী ধ্বনিযুক্ত যৌগিক স্বরধ্বনি শোনা যায় না।

২.১.৬ বাংলায় প্রতিটি স্বরধ্বনি সানুনাসিকও হতে পারে। বহুক্ষেত্রে স্বরধ্বনির সানুনাসিকতা অর্থের পার্থক্যও ঘটায়।

উদাহরণ ঃ কাদা-কাঁদা; বাধা-বাঁধা; ইত্যাদি

ত্রিপুরার কথ্য বাংলায় সানুনাসিকতা কম, ককবরকে স্বরধ্বনির সানুনাসিকতা ও তার ফলে অর্থের পার্থক্য ঘটার উদাহরণ পাওয়া যায় না।

২.২ ব্যঞ্জনধ্বনি

২.২.১ বাংলায় ব্যঞ্জনধ্বনি মোট ৩০টি। পর পৃষ্ঠায় এগুলির একটি নির্লেখ দেওয়া গেল।

বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনি

উচ্চারণ রীতি \ উচ্চারণ স্থান		ওষ্ঠ্য		দন্তৌষ্ঠ্য		দন্ত্য		দন্ত মূলীয়		মূর্ধণ্য দন্তমূলীয়		তালব্য দন্ত মূলীয়		তালব্য		জিহ্বা মূলীয়		কণ্ঠ্য
		অঘোষ	ঘোষ	অঘোষ	ঘোষ	অঘোষ	ঘোষ	অঘোষ	ঘোষ	অঘোষ	ঘোষ	অঘোষ	ঘোষ	অঘোষ	ঘোষ	অঘোষ	ঘোষ	ঘোষ
স্পৃষ্ট	অল্পপ্রাণ	প	ব			ত	দ			ট	ড					ক	গ	
	মহাপ্রাণ	ফ	ভ			থ	ধ			ঠ	ঢ					খ	ঘ	
ঘৃষ্ট	অল্পপ্রাণ											চ	জ					
	মহাপ্রাণ											ছ	ঝ					
উষ্ম		(ফ)	(ভ)	(ফ)	(ভ)	স	(জ)					শ						হ
নাসিক্য			ম						ন								ঙ	
পার্শ্বিক									ল									
কম্পনজাত									র									
তাড়ন জাত											ড়							
অর্ধ স্বর															য়			

১.১.১ ককবরক ব্যঞ্জন ধ্বনি মোট [illegible] নিচের তালিকায় দেখানো হল।

ককবরক ব্যঞ্জনধ্বনি

উচ্চারণ রীতি \ উচ্চারণ স্থান		ওষ্ঠ্য		দন্তৌষ্ঠ্য		দন্ত্য		দন্ত মূলীয়		মূর্ধণ্য দন্তমূলীয়		তালব্য দন্ত মূলীয়		তালব্য		জিহ্বা মূলীয়		কণ্ঠ্য
		অঘোষ	ঘোষ	অঘোষ	ঘোষ	অঘোষ	ঘোষ	অঘোষ	ঘোষ	অঘোষ	ঘোষ	অঘোষ	ঘোষ	অঘোষ	ঘোষ	অঘোষ	ঘোষ	ঘোষ
স্পৃষ্ট	অল্পপ্রাণ	প	ব			ত	দ									ক	গ	
	মহাপ্রাণ															খ		
ঘৃষ্ট	অল্পপ্রাণ					(চ)						চ	জ					
	মহাপ্রাণ																	
উষ্ম		ফ		(ফ)		স	(জ)											হ
নাসিক্য			ম						ন								ঙ	
পার্শ্বিক									ল									
কম্পনজাত									র									
অর্ধ স্বর			[illegible]												য়		[illegible]	

২.২.৩ বাংলা ও ককবরক ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি আলোচনা করলে দেখতে পাই —

(ক) /প/,/ব/,/ত/,/থ/,/দ/,/ক/,/খ/,/গ/,/জ/,/স/,/হ/,/ল/,/র/,/য়/, /ম/,/ন/ এবং /ঙ/ এই সতেরোটি ব্যঞ্জনধ্বনি হুবুহু এক।

(খ) বাংলায় /ট/,/ঠ/,/ড/,/ঢ/, এই চারটি মূর্ধণ্য ধ্বনি আছে। ককবরকে কোনো মূর্ধণ্য ধ্বনি নেই।

(গ) বাংলায় মূর্ধণ্য /ঢ/ ছাড়াও ঔষ্ঠ্য/ ভ/, /দন্ত্য/,/ধ/, জিহ্বামূলীয় /ঘ/ এই তিনটি স্পৃষ্ঠ এবং তালব্য দন্তমূলীয় ঘৃষ্ঠ/ঝ/, মোট এই পাঁচটি ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি আছে। ককবরকে কোনো ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি নেই। তবে বাংলাদেশের পদ্মানদীর পূর্বতীর থেকে পূর্বদিকে উত্তব পূর্ব ভারতের প্রায় সমস্ত ভাষায়ই ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনির অল্পপ্রাণ হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। সুনীতি কুমার (চট্টোপাধ্যায় ১৯৩৯/৮৯ পৃঃ ৪৪) বলেন-"পূর্ববঙ্গের কথিত ভাষায় ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনির উচ্চারণ বিশুদ্ধভাবে করা হয় না।"

(ঘ) বাংলার অঘোষ মহাপ্রাণ ঔষ্ঠ্য স্পৃষ্ঠ ধ্বনি /ফ/ এর কোনো হুবুহু প্রতিরূপ ককবরকে নেই। ককবরকের /ফ/ ধ্বনিটি একটি অঘোষ ওষ্ঠ্য উষ্ম ধ্বনি। এটিকে মাঝে মাঝে দন্তৌষ্ঠ্য হিসাবে উচ্চারিত হতেও শোনা যায়।

(ঙ) বাংলায় একটি অঘোষ মহাপ্রাণ দন্তমূলীয়-তালব্য ঘৃষ্ট /ছ/ ধ্বনি আছে। ককবরকে এটি নেই। ত্রিপুরার কথ্য বাংলায়ও এই ধ্বনিটি প্রায় শোনা যায় না। ত্রিপুরার বাংলায় এটি অঘোষ অল্পপ্রাণ দন্ত্য / স-S/ হয়ে গেছে। তবে বক্তা খুব সতর্ক থাকলে /ছ/ উচ্চারণও করেন। তবে তা হয় ক্বচিৎ।

(চ) বাংলা ও ককবরক উভয় ভাষাতেই অঘোষ অল্প প্রাণ দন্তমূলীয় তালব্য-ঘৃষ্ট/চ/ ধ্বনিটি আছে। কিন্তু ককবরকে এটি প্রায়শই অঘোষ দন্ত্য উষ্ম/স-S/ হয়ে যায়।

(ছ) বাংলায় একটি অঘোষ তালব্য দন্ত মূলীয় উষ্ম ধ্বনি /শ/ আছে। একটি ঘোষ মূর্ধন্য দন্তমূলীয় তাড়ন জাত ধ্বনি / ড়/ ও আছে বাংলায়। ককবরকে এই দুইটি ধ্বনি নেই।

(জ) বাংলায় ঔষ্ঠ্য জিহ্বামূলীয় অর্ধস্বর /W/ ধ্বনিটির ব্যবহার প্রায় নেই। বাংলা বর্ণমালার বর্গীয় 'ব' ও অন্তস্থ 'ব' একাকার হয়ে গেছে। কিন্তু ককবরকে /W/ ধ্বনিটি আছে। এটিকে 'উা' রূপে লেখা হয়।

২.৩ প্রস্বর প্রক্রিয়া, শ্বাসঘাত, ঝোঁক বা বল (accent)

বাক্যের উচ্চারণের সময় বাক্যের অন্তর্গত পদগুলির মধ্যে কোনো কোনো পদে বা কোনো পদের একটি অক্ষরে (syllable) বক্তা একটু বেশি জোর বা ঝোঁক দিয়ে উচ্চারণ করেন। এই ঝোঁককে strees বলা হয়। এই ঝোঁক প্রক্রিয়াকে accent বলে। ইংরেজী সহ কোনো কোনো ভাষায় এই ঝোঁক অর্থের পার্থক্যও ঘটায়। ঝোঁক স্থান পরিবর্তন করলে অর্থও ভিন্ন হয়ে যায়। বাংলা ও ককবরকে ঝোঁক অর্থের দ্যোতনা করে না।

২.৪ স্বন্ (tone)

স্বন্ স্বরধ্বনি বৈশিষ্ট্য। সাধারণ কথাবার্তায় বক্তা স্বাভাবিক স্বনতীক্ষ্ণতা (pitch) ব্যবহার করে। ক্রোধ, আনন্দ, বিষাদ, প্রভৃতি মনোভাবের প্রভাবে স্বনতীক্ষ্ণতা কখনো নীচে নেমে যায়, আবার কখনো উপরে উঠে যায়। অর্থাৎ স্বনতীক্ষ্ণতা সাধারন থাকলে বা নীচে নেমে গেলে বা উপরে উঠে গেলে তাতে বক্তার মনের ভাব প্রকাশিত হয়, শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটায় না।

কিন্তু কোনো ভাষায় স্বনতীক্ষ্ণতার উচ্চতা-নিম্নতা অর্থের পার্থক্য ঘটায়। চৈনিক, থাই, প্রভৃতি ভাষায় এই বৈশিষ্ট্য আছে। ককবরকে কিছু কিছু শব্দের একাধিক অর্থ আছে। বিভিন্ন পরিবেশে এদের উচ্চারণের সময স্বনতীক্ষ্ণতার পার্থক্যও লক্ষ্য করা যায়। এই জন্য লেখায় স্বনতীক্ষ্ণতা দেখানো প্রয়োজন বলে অনেকে মনে করেন। আমরা এই ধারণাকে সঠিক মনে করি না। বর্তমান লেখকের 'ককবরক সীমাঙমা' গ্রন্থে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। এখানেও সেই উদাহরণটি দেওয়া গেল।

(ক) বল কোথায়। তাড়াতাড়ি বল। দেরী করিস না। (বল- say)

(খ) বল কোথায়? বলটা আবার হারিয়েছ? (বল-ball)

(গ) বল কোথায়? এসব দুর্বলের কাজ নয়। (বল-strength)

উপরের তিনটি উক্তিতেই প্রথম শব্দটি 'বল'। অবশ্য তিন জায়গায়/অ/ স্বরধ্বনিটি তিন প্রকার স্বনতীক্ষ্ণতায় উচ্চারিত। কিন্তু এই জন্য বাংলা লেখায় স্বনতীক্ষ্ণতা দেখানো হয় না। ককবরকেও বিষয়টি অনুরূপ। সেই জন্য ককবরক লেখায়ও স্বনতীক্ষ্ণতা দেখানো হয় না।

২.৫ উচ্চারণ।

মানুষের ভাষা তার মুখ ও নাক দিয়ে উচ্চারিত কতকগুলি ধ্বনির শৃঙ্খল মাত্র। মানুষের মস্তিষ্ক প্রয়োজন মত মনের ভাবকে ধ্বনি শৃঙ্খলে পরিণত করে এবং জিহ্বা, মুখ, নাক ইত্যাদি দিয়ে এগুলি উচ্চারণ করায়। মস্তিষ্কই আবার কান দিয়ে ঐ শব্দগুলি শোনে, ধ্বনিকে ভাবে রূপান্তরিত করে, তা বোঝে। বক্তা ও শ্রোতার ভাবের আদান প্রদান এইভাবে ধ্বনিকে বাহন করে চলে। মুখে বলা ও কানে শোনা এই ভাষা তাৎক্ষণিক ভাষা, বলা ও শোনা মাত্রই তার আয়ুষ্কাল। মনে অবশ্য কিছুক্ষণ থাকে,তবে তাও বেশীক্ষণ নয়। মানুষ এই ভাষাকে দীর্ঘায়ু করতে চাইল। ফলে তার চাওয়া রূপ নিল লেখায়। সৃষ্টি হল বর্ণমালার। তবে পৃথিবীতে মানুষের ভাষা আছে কয়েক হাজার, বর্ণমালার সংখ্যা কিন্তু অনেক কম। একদিকে এখনও বহু ছোট ছোট ভাষা লিখিত রূপ পায়নি। অপরদিকে একটি বর্ণমালায় লেখা হচ্ছে বহু ভাষা। রোমান বর্ণমালায় লিখিত হচ্ছে ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান, স্পেনীয় সহ অনেক ভাষা।

মানুষের ভাষা বিচিত্র। প্রত্যেকটি মানুষের ভাষা আলাদা, গলার স্বর, বাচনভঙ্গী, ইত্যাদিতে প্রতিটি বক্তা অনন্য। তার উপরে পার্থক্য আছে, ধর্মীয়, আঞ্চলিক, বৃত্তিগত, শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদিরও। নদীয়া ও ত্রিপুরার বাংলা এক নয়। চর্মকারদের বাংলা ও মৎস্যজীবিদের বাংলায় পার্থক্য আছে। উচ্চিশিক্ষিতের বাংলা ও নিরক্ষরের বাংলা আলাদা। সবচেয়ে বড় পার্থক্য আসে কালভেদে। ১৯৯০ খৃষ্টাব্দের বাংলার সঙ্গে ১৯৪০,১৮৯০ বা ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের

বাংলার যথেষ্ট তফাৎ দেখা যাবে। কিন্তু লেখায় এইসব পার্থক্য দেখানো হয় না। কেউ কেউ ইদানীং আঞ্চলিক ভাষাকে লিখিত রূপ দিয়ে সাহিত্যের আসরে নিয়ে আসছেন। কিন্তু এমন লেখার সংখ্যা নগন্য। কিন্তু সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, মানিক বন্দোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহন রায়, মীর মোশারফ হোসেন, রেজাওল করীম ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ বাণীবদ্ধ হয়ে বিরাজ করছেন আমাদের ঘরে ঘরে পাশাপাশি। তখনই দেখা যায় উচ্চারণ সমস্যা, প্রয়োজন হয়ে পড়ে উচ্চারণ অভিধানের।

২.৫.১ বাংলা লিখিত রূপ ও তার উচ্চারণ

বাংলা ভাষার লিখিত রূপ ও তার উচ্চারণে কোনও তফাৎ নেই বলেই সাধারণের ধারণা। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১২৯২ বাং পৃঃ ৮) লিখেছেন যে, 'পূর্বে আমার বিশ্বাস ছিল আমাদের বাংলা অক্ষর উচ্চরণে কোনও গোলযোগ নাই। কেবল তিনটি স, দুটো ন ও দুটো জ শিশুদিগকে বিপাকে ফেলিয়া থাকে।' কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজেই দেখিয়েছেন যে তাঁর ঐ ধারণা ঠিক নয়। লিখিত বাংলা ও তার উচ্চারণে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়।

আমরা নীচে লিখিত বাংলা ও তার উচ্চারণের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি লিপিবদ্ধ করছি।

(ক) বাংলা বর্ণমালা দেবনাগরী বর্ণমালার অনুরূপ হলেও ইতিমধ্যে তাতে কিছু ব্যত্যয় এসে গেছে। ৯ বাংলা বর্ণমালায় এখন আর নেই। বর্গীয় ও অন্তস্থ ব একাকার হয়ে গেছে। অন্তস্থ য এর উচ্চারণ বর্গীয় জ এর মত হয়ে যাওয়ায় য এর নীচে বিন্দু দিয়ে য় তৈরী করতে হয়েছে।

(খ) বাংলা বর্ণমালায় দীর্ঘ ও হ্রস্ব স্বরবর্ণ ও স্বরচিহ্ন আছে। কিন্তু বাংলা উচ্চারণে ধ্বনির দীর্ঘ ও হ্রস্ব মানা হয় না। ফলে শিক্ষার্থীর বানান সমস্যা দেখা দেয়।

(গ) সংস্কৃত ও সংস্কৃতজ বড় ভাষাগুলিতে তথা দ্রাবিড় ভাষাগুলিতে বর্ণমালার প্রথম দুটি অক্ষর (অ) আ) একটি স্বরধ্বনির - নিম্ন কেন্দ্রীয়-বিবৃত-হ্রস্ব ও

দীর্ঘ প্রকার দ্যোতনা করে। অর্থাৎ প্রথমটি দ্বারা যে ধ্বনি প্রকাশ পায় দ্বিতীয়টি দ্বারাও সেই ধ্বনি প্রকাশ পায়। প্রথমটি হ্রস্ব ও দ্বিতীয়টি দীর্ঘ। কিন্তু বাংলা অহমীয়া ও ওড়িয়া ভাষায় এই অক্ষর দুটি গুণগত ভাবেই দু রকম ধ্বনি দ্যোতনা করে। প্রথমটি নিম্ন-পশ্চাৎ-বর্তুল, দ্বিতীয়টি নিম্ন-কেন্দ্রীয়-বিবৃত। অন্য স্বরচিহ্ন যুক্ত না থাকলে বাংলার প্রায় সমস্ত ব্যঞ্জন বর্ণই অ-কার যুক্ত হয়ে উচ্চারিত হয়। ফলে বাংলা উচ্চারণ পদ্ধতি হিন্দী ইত্যাদি ভাষা থেকে আলাদা হয়ে গেছে।

বাংলা পড়ার সময় একটা বড় সমস্যা দেখা দেয় কোথায় ব্যঞ্জন বর্ণের সঙ্গে অ-কারটি উচ্চারিত হবে আর কোথায় হবে না তা নিয়ে। 'যত মত তত পথ' এই আপ্ত বাক্যটির প্রথম ও তৃতীয় শব্দ দুটি স্বরান্ত ও দ্বিতীয় ও চতুর্থ শব্দ দুটি ব্যঞ্জনান্ত। বাংলা যাদের প্রথম ভাষা তাদের জন্য এগুলি বড় সমস্যা নয়। কিন্তু বাংলা যারা পরে শেখেন তাদের জন্য এগুলি বড় সমস্যা বটে।

(ঘ) বর্ণমালায় তালব্য শ, মুর্ধন্য , এবং দন্ত্য স নামের তিনটি অক্ষর থাকলেও বাংলায় প্রধানতঃ শ- অঘোষ তালব্য-দন্ত্য মূলীয়-উষ্ণ-ধ্বনিটিই উচ্চারিত হয়। বাকি দুটি সীমিত বিশেষ পরিবেশে উচ্চারিত হয়ে থাকে (মুখ্যতঃ সংযুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনির বেলায়)।

(ঙ) বাংলা বর্ণমালায় র ড় ঢ় তিনটি অক্ষর আছে। তৃতীয়টির ব্যবহার খুবই কম। প্রথম ও দ্বিতীয়টি পশ্চিমবঙ্গে উচ্চারিত হয় স্পষ্ট পৃথকভাবে। কিন্তু বাংলাদেশ ও ত্রিপুরায় তিনটিই র হয়ে উচ্চারিত হয়।

(চ) বাংলার ঘোষ মহাপ্রাণ স্পৃষ্ট ধ্বনিগুলি বাংলাদেশ, ত্রিপুরা তথা সমগ্র পূর্বাঞ্চলে তাদের মহাপ্রাণ গুণ হারিয়েছে। তবে শব্দ অন্তের ঘোষ মহাপ্রাণ স্থান নির্বিশেষে সর্বত্রই অল্প প্রাণের মত উচ্চারিত হয়। বাঘ, সাঁঝ, কাঁধ, লাভ,প্রভৃতি শব্দ বাগ, সাঁজ, কাঁদ, লাব, হয়ে উচ্চারিত হয়। তবে মহাপ্রাণ ধ্বনিটির আগের স্বরধ্বনিটি দীর্ঘ হয়ে যায়।

(ছ) বাংলায় বর্গীয় ও অন্তস্থ ব লেখায় ও উচ্চারণে অভিন্ন ঘোষ-অল্পপ্রাণ ওষ্ঠ্যস্পৃষ্ট ব হয়ে গেছে।

(জ) বাংলায় জ এবং য উভয়েই ঘোষ অল্পপ্রাণ তালব্যবদন্তমূলীয় ঘৃষ্ট ধ্বনিটি দ্যোতনা করে।

(ঝ) বাংলায় দন্ত্য ন ও মূর্ধন্য ণ উভয়েই দন্তমূলীয় ন রূপে উচ্চারিত হয়।

(ঞ) বাংলায় লেখা ও উচ্চারণের পার্থক্য সবচেয়ে বেশী যুক্তাক্ষরে। ব-ফলা, ম-ফলা ও য-ফলায় ব, ম, ও য উচ্চারিত হয় না। তার বদলে যে অক্ষরটির সঙ্গে ফলা যুক্ত হয় সেটির দ্বিত্ব হয়। যেমন অশ্ব-অশ্‌শ, আত্মা-আত্তা, বিদ্যা-বিদ্দা।

তবে কিছু ব্যতিক্রমও আছে। র এর সঙ্গে অন্য ধ্বনি যুক্ত হলে র রেফ (র্) হয়ে যায় এবং সব ধ্বনিই ঠিকমত উচ্চারিত হয়। যেমন - গর্ব, কর্ম, কার্য।

ম এর সঙ্গে ব-ফলা ও য-ফলা ঠিকমত উচ্চারিত হয়। যেমন - কম্বল, সম্বল, গম্য, কাম্য।

ঙ এবং ন এর সঙ্গে ম-ফলা ঠিকমত উচ্চারিত হয়। যেমন - বাঙ্ময়, মৃন্ময়।

(ট) যুক্তাক্ষর ক্ষ ক্‌খ এর মত উচ্চারিত হয়। যেমন - অক্ষর - অক্‌খর।

(ঠ) বাংলায় চিহ্ন, আহ্লাদ, হৃদয়, যথাক্রমে চিন্ন, আল্লাদ, রিদয় রূপে উচ্চারিত হয় বেশীর ভাগ বক্তার মুখে।

২.৫.২ ককবরকের লিখিত রূপ ও উচ্চারণ

ককবরক লিখিত রূপে উত্তরিত হয়েছে বিংশ শতাব্দীতেই। বাংলা অক্ষরেই লিখিত হচ্ছে ককবরক। এতে দুই দিকে লাভ হচ্ছে। প্রথমতঃ ককবরক ভাষীদের নিকটতম প্রতিবেশী বাংলাভাষী। একটি বর্ণমালা শিখলেই তার দুটি ভাষা শেখার পথ পরিষ্কার হয়। দ্বিতীয়তঃ বাংলাভাষী জিজ্ঞাসা, কৌতুহল বা

প্রয়োজনে ককবরক শিখতে চাইলে তা অনায়াসে করতে পারবে। তাকে নতুন একটা বর্ণমালার পর্বত অতিক্রম করে ককবরকে প্রবেশ করতে হবে না।

ককবরক বানান এখনও শিলীভূত হয় নি। প্রতিটি লেখকই চেষ্টা করছেন মূল ককবরক শব্দগুলিকে উচ্চারণানুগ রাখতে। দু একটি জায়গায় বাংলা অক্ষরটি ককবরকে একটু অন্যরূপে উচ্চারিত হয়। আমরা নীচে এগুলি লিপিবদ্ধ করছি।

(ক) স অক্ষরটি সর্বত্র ইংরেজী S অক্ষরের ধ্বনিটি দ্যোতনা করে। এটি অঘোষ দন্ত্য উষ্ম ধ্বনি।

(খ) ককবরকে ফ অক্ষরটি দ্বারা অঘোষ ঔষ্ঠ্য উষ্ম ধ্বনি বোঝায়।

(গ) ব্যঞ্জন বর্ণগুলিতে যদি স্বরচিহ্ন যুক্ত থাকে তবে আর উচ্চারণ বিভ্রাট থাকে না। কা, কি, কু উচ্চারণে কোনও অসুবিধা নেই। কিন্তু ব্যঞ্জন বর্ণ স্বরচিহ্নহীন অবস্থায় থাকলে কোনটা অ-যুক্ত আর কোনটা নয় তা নিয়ে সন্দেহ জাগে। ককবরক শব্দটিতে প্রথম ক-টি অ-যুক্ত, অন্য দুটি নয়। উচ্চারণের সুবিধার্থে ককবরকে এর জন্যও একটি অলিখিত নিয়ম আছে। নিয়মটি খুবই সরল।

ককবরকে প্রায় সমস্ত syllable ই ব্যঞ্জনান্ত। Syllable এর অন্ত্য অক্ষরটি স্বরচিহ্নযুক্ত বা যুক্তাক্ষর হলে তা স্বরান্ত হয়। এই নিয়মের বাইরে কোনও অন্ত্য অক্ষর অ-যুক্ত হলে তা অক্ষরটির পরে apostrophe দিয়ে বোঝানো হয়। নীচের উদাহরণগুলিতে বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

ব-সে (একটি মাত্র অক্ষর বলে এখানে apostrophe র দরকার নেই।)

কক-ভাষা, কথা (ব্যঞ্জনান্ত)

বরক - মানুষ (ব্যঞ্জনান্ত)

মমফল - পেপে (ব্যঞ্জনান্ত)

বলঙ্গ-বনে, জঙ্গলে (যুক্তাক্ষর হলে স্বরান্ত হয়।)

খাঙ - যায়

আন' - আমাকে (স্বরান্ত দেখাতে apostrophe দেওয়া হয়েছে)

বানগ' - তৈরী করে (')

ককবরকে syllable নিম্নরূপ।

এক অক্ষরে একটি। যেমন ঃ আ- মাছ

দুই অক্ষরের শব্দে একটি। (যেমন ঃ নগ -ঘর)

তিন অক্ষরের শব্দে দুটি । (যেমন নরগ-তোমরা (নর্-অগ অথবা ন-রগ)

চার অক্ষরের শব্দে দুটি। (যেমন ঃ বখরক- মাথা (বখ্-রক্)

ককবরকে অধিকাংশ শব্দই এক, দুই বা তিন অক্ষরের। দীর্ঘশব্দ বিরল। সুতরাং এই ভাষায় উচ্চারণ খুব সহজ।

(৩) শব্দ ভান্ডার

৩.১ বাংলা একটি উন্নত আধুনিক ভাষা। সাহিত্যে, শিল্পে, বিজ্ঞানে, দর্শনে, চিকিৎসাবিদ্যায়, যান্ত্রিক প্রকৌশলে, ব্যবসায়ে, ধর্মালোচনায়, রাজনীতিতে, প্রশাসনে, ন্যায়ালয়ে, সর্ববিষয়ে বাংলার ব্যবহার হয়ে আসছে। ঐতিহাসিক কারণে বাংলা ভাষা আরবী, ফারসী, ইংরেজী, হিন্দী, মাগধী, পালি, অহমীয়া, ওড়িয়া, প্রভৃতি ভাষার সংস্পর্শে এসেছে এবং যখনই প্রয়োজন পড়েছে তখনই ঐসব ভাষা থেকে শব্দ গ্রহণ করে নিজের শব্দভান্ডার সমৃদ্ধ করেছে। বাংলা ভাষার শব্দ ভান্ডারে পর্তুগীজ, ডাচ, রুশ, লাতিন, তিব্বতী, প্রভৃতি ভাষার শব্দও মেলে। সবার উপরে আছে সংস্কৃত। সংস্কৃতজ সমস্ত ভাষার মধ্যে বাংলাই এখনও সংস্কৃতের নিকটতম ভাষা হয়ে আছে। বাংলাভাষার বক্তাগণ অবলীলাক্রমে যদৃচ্ছ সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করছে। শুনতে আশ্চর্য লাগলেও একথা সত্য যে বাংলা ভাষায় তৎসম ও তদ্ভব শব্দের পরিমাণ সম্পূর্ণ শব্দ ভান্ডারের চার পঞ্চমাংশেরও বেশী। বহুমুখী ব্যবহার ও চিন্তার ফলে বাংলা ভাষার শব্দভান্ডার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে, বিশাল হয়ে উঠেছে এবং ক্রমাগত আরো বড় হয়ে উঠছে। বাংলাদেশ ও ভারত সহ পৃথিবীর বহু দেশে বাংলাভাষী আছে।

৩.২ ত্রিপুরার অবস্থা কিন্তু অন্য রকম। ত্রিপুরাবাসী জনগণের ভাষাকে প্রধানতঃ দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়। একটি হল অরণ্য পর্বতবাসীগণের ভাষা, আর অন্যটি হল সমতলবাসীগণের ভাষা। কিন্তু গত দুই শত বৎসর ধরে বহু অরণ্য পবর্তবাসী তাদের বাসস্থান ও ঘুরে বেড়ানো স্বভাব ছেড়ে সমতলে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। এই অরণ্য পর্বতবাসীদের বোঝানোর জন্য সারা পৃথিবীতেই এদেরকে উপজাতি অভিধা দেওয়া হয়। তবে ত্রিপুরার সকল উপজাতি অধিবাসীগণ এক সম্প্রদায়ের নহেন। এরা উনিশটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। এদের প্রত্যেকরই একটি ভাষা আছে। তবে ত্রিপুরী, রিয়াং, জমাতিয়া ও নোয়াতিয়া এই চারটি সম্প্রদায়ের ভাষা প্রায় এক রকম — অর্থাৎ এগুলি একটি ভাষারই চারটি ডায়ালেক্ট। ভাষাটি হল ককবরক। এই পুস্তকে এই ভাষাটিরই দর্শন, অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ করে এর সঙ্গে বাংলার তুলনামূলক আলোচনা করা হচ্ছে। উদ্দেশ্য দুটি ভাষারই শিক্ষণ, প্রশিক্ষণ ও উন্নতি বিধান সহজতর করা।

৩.৩ প্রত্যেক ভাষার বক্তারই প্রয়োজন হয় তার চার পাশে যে সব প্রাণী ও বস্তু সামগ্রী আছে তাদের নামের জন্য শব্দ (বিশেষ্য), অবস্থান, গতি বা কাজ বোঝাবার জন্য প্রয়োজনীয় শব্দ (ক্রিয়া); বড়, ছোট, ভাল, মন্দ, ইত্যাদি গুণবাচক কিছু শব্দ (বিশেষণ) কোন ব্যক্তি বা বস্তুর নাম বিরক্তিকর ভাবে বার বার ব্যবহার পরিহার করার জন্য কিছু প্রতিকল্প শব্দ (সর্বনাম); আর এই সব শব্দ দিয়ে বাক্য গড়ে তোলার জন্য দরকার হয় কিছু শব্দ ও কিছু আপাত অর্থহীন ধ্বনি (অব্যয়, প্রত্যয়, বিভক্তি চিহ্ন, কাল চিহ্ন, ইত্যাদি।

৩.৪ বাংলা ও ককবরক উভয় ভাষাতে স্বভাবতঃই এই সব আছে। বাংলায় সকল শ্রেণীর শব্দই ককবরকের চেয়ে বেশী। বাংলার বিশাল শব্দভান্ডারের চার পঞ্চমাংশেই সংস্কৃত বা সংস্কৃতজ। আর আছে দেশী ও বিদেশী শব্দ। দীর্ঘকাল ধরে বাংলা ভাষা বিভিন্ন ভাষার সম্পর্কে এসেছে। মুসলমান শাসন আমলে বাংলা আরবী ও ফার্সীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কে এসেছিল, বৃটিশ আমলে ইংরেজীর সঙ্গে। ফলে আরবী, ফার্সী ও ইংরেজী থেকে বহু শব্দ এসেছে বাংলায়। এছাড়াও বাংলায় বহু অন্য ভাষা থেকে আসা শব্দ আছে। এদের অধিকাংশই এসেছে ইংরেজীর মাধ্যমে।

৩.৫ ককবরকের বাংলার মত কোনও সম্পদশালী উত্তরাধিকার নেই। সহজ জীবন যাপনকারী ককবরকভাষী তার পরিবেশের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সমস্ত কিছুরই একটা নাম দিয়েছেন। যে সকল কাজ তাদের করতে হয় সেগুলি প্রকাশ করার মত ক্রিয়াপদও তার আছে। সাধারণ গুণ দোষ ও তার ভাষায় প্রকাশ করা যায়। বার বার একই শব্দ ব্যবহার করার এক ঘেয়েমী থেকে বাঁচবার জন্য কিছু সর্বনাম শব্দও আছে ককবরকে। আর এই সব শব্দ গেঁথে বাক্য তৈরী করার জন্য সে অল্প কিছু শব্দ এবং কিছু আপাত অর্থহীন ধ্বনিও ব্যবহার করে। ককবরক বাংলা ছাড়া অন্য কোনও বড় ভাষার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কে আসেনি। সুতরাং ককবরকভাষীগণ অন্য যে কোন ভাষাভাষীর মতই প্রয়োজনে নিকটের ভাষাটি থেকে শব্দ গ্রহণ করেছে ও করছে নিজের মনের ভাবকে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করতে। অন্য ভাষা থেকে আসা শব্দ ককবরকে খুব কম। যে সব শব্দ অন্য ভাষা থেকে এসেছে সেগুলি বাংলার মাধ্যমেই এসেছে সেকথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

৩.৬ তাই দেখি ককবরকে হা (মাটি, দেশ, পৃথিবী), হাচুক (পাহাড়), তৈইমা (নদী) , লামা (পথ) ইত্যাদি শব্দ তো আছে, কিন্তু মাঠ, ঘাট, বিল, হ্রদ ইত্যাদি শব্দ নেই। নগ (ঘর) শব্দটি আছে, কিন্তু অট্টালিকা, প্রাসাদ, একতলা, দোতলা, ইত্যাদি শব্দ নেই। কামি (গ্রাম) শব্দটি আছে, কিন্তু গঞ্জ, শহর, বন্দর, রাজধানী, ইত্যাদি শব্দ নেই। সাল (দিন), হর (রাত), ফুঙ (সকাল), সাইরিগ (সন্ধ্যা) ইত্যাদি শব্দ আছে, কিন্তু দুপুর, নিশীথ, ইত্যাদি শব্দ নেই। ককবরকে মসা (বাঘ), মাইয়ুঙ (হাতি), মুসুই (হরিন), মৌখরা (বানর), ইত্যাদি শব্দ আছে, কিন্তু সিংহ, গন্ডার, ইত্যাদি শব্দ নেই। এটাই স্বাভাবিক। যে সব বস্তু বা প্রাণী ককবরক ভাষীর পরিবেশে অনুপস্থিত তাদের কোনও নামও নেই তার ভাষায়।

ককবরকে কতর (বড়), কুচু (ছোট), কাহাম (ভাল), হাময়া (মন্দ), কথক (মিষ্টি), কুকুই (টক), ইত্যাদি বিশেষণ শব্দ আছে, কিন্তু উৎকৃষ্ট, নিকৃষ্ট, সাধারণ, অসাধারণ, ইত্যাদি শব্দ নেই।

থাঙ (যা), ফাই (আস্), তঙ (থাক), চা (খা) থুঙ (খেল), মীনয় (হাস), কাব (কাঁদ) ইত্যাদি ক্রিয়াবাচক শব্দ ককবরকে আছে, কিন্তু আঁক, মেনে নে, আশ্চর্য হ ইত্যাদি শব্দ নেই।

বাফা (বাবা), বামা (মা) , বাসা (ছেলে), বাসাজুক (মেয়ে), বাসাই (স্বামী), বিহিক (স্ত্রী) ইত্যাদি নিকট সম্বন্ধ বাচক শব্দ ককবরকে আছে, কিন্তু কাকা, কাকি, মামা, মামি, ভাইপো, ভাইঝি, ভাগ্নে, ভাগ্নী, ইত্যাদি সামান্য দূর সম্পর্ক দ্যোতক শব্দ নেই।

ককবরকে আঙ (আমি), নাঙ (তুমি, তুই, আপনি), ব (সে), সাব' (ক) অব' (এটি) ইত্যাদি সর্বনাম শব্দ আছে, কিন্তু যে, যা, যিনি, ইত্যাদি শব্দ নেই। এই জন্য ককবরকে জটিল বাক্য হয় না। ভাষার বক্তাদের জীবন যাত্রার মত ভাষাটির বাক্যরীতিও সরল, জটিল নয়।

৩.৭ যে সব শব্দ ককবরকে প্রয়োজন আছে অথচ ভান্ডারে নেই সেইগুলি অন্য ভাষা (এই ক্ষেত্রে বাংলা) থেকে নেওয়া হয়। এইভাবে বাংলা থেকে নেওয়া

বহু শব্দ অবিকৃত ভাবেই ককবরকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বহু শব্দ বিকৃত হয়ে গেছে। এই সব শব্দের সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া সম্ভব নয় দুই কারণে। প্রথমতঃ ঐ তালিকা অতি দীর্ঘ হয়ে পড়বে। দ্বিতীয়তঃ তালিকাটি কখনই সম্পূর্ণ হয়ে যাবে না। কারণ নতুন শব্দ প্রতিনিয়তই যাবে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায়। তবু নীচে একটি অতিদীর্ঘ তালিকা দিলাম। এ থেকেই অনুমান করা যাবে বাংলা থেকে বা বাংলার মাধ্যমে অন্য ভাষা থেকে আসা শব্দের পরিমাণ ককবরকে কতটুকু।

বিশেষ্য ঃ আইন, আউস (সখ), আতুর, আল (হাল-চাষ), উদিস (উদ্দেশ্য), উসতা (লাথি), কনি (কনুই), কলিজা (হৃদয়), কারাই (কড়াই), কাসলা (বড় মাটির পাত্র), খরান (অনাবৃষ্টি), খুরি (পেয়ালা), গলস (গ্লাস), গাতি (ঘটি), গাদা (গাধা), গুদ্‌দি (ঘুড়ি), দাম, দেশা (এঁড়ে বাছুর), নারা (খড়), পজা (পোষা), পরদান (প্রধান), পালা (নাটক), পুইসা, পুথি, ফুতলা (পুতুল), বইরাতি (পরশুরাম), বগা (বক), বাউইয়া (বামন), বানজি (বন্ধ্যা), বিখা (ভিক্ষা), বেরেস (বৃষ), মসলা, মুলাই (মুলা), মেরা (ভেড়া), ইত্যাদি।

বিশেষণ ঃ উদাম (খোলা), উলতা, আমিস, নেরামিস, পুইলা, বিবাক, মিক, জত্ত (সব) ইত্যাদি।

ক্রিয়া ঃ কমগ (কমা,হ্রাস পাওয়া), কুলগ (কুলিয়ে যাওয়া), খুর (খোঁড়া, খনন করা) গসি (মেনে নেওয়া), গইরগ (গড়াগড়ি দেওয়া), গুরুম (বজ্রের মত গর্জন করা), চালগ (চালানো), চিরগ (ছেঁড়া), নর (নড়ানো), পরি (পড়া), বানগ (তৈরী করা), বদলন (বদলানো), বারগ (বেড়ে যাওয়া), বিলাই (বিলিয়ে দেওয়া), বুজি (বুঝতে পারা), বেরাই (বেড়ানো), ইত্যাদি।

বাংলা থেকে বা বাংলার মাধ্যমে অন্য ভাষা থেকে আসা সকল শব্দকে এখন আর আগত শব্দ বলে চেনা যায় না। কারণ শব্দগুলির চেহারা এখন মূল ককবরক শব্দের মতই হয়ে গেছে। এই রকম কয়েকটি শব্দ নীচে দেওয়া গেল।

অচাই (পুরোহিত, চিকিৎসক) শব্দটি বাংলার 'ওঝা' শব্দের সম-মূলীয় মনে হয়। ওঝা-ওজা-অজা-অজাই-অচাই।

করাই (ঘোড়া) শব্দটি বাংলার 'ঘোড়া' শব্দেরই অপভ্রংশ বলে মনে হয়। ঘোড়া-গরা-গরাই করাই।

কামি (গ্রাম) শব্দটিও 'গ্রাম' শব্দেরই অপভ্রংশ বলা যায়। গ্রাম-গাম-গামি-কামি। উল্লেখ যোগ্য যে অচাই, করাই, কামি, ইত্যাদি প্রতিটি শব্দের শেষে একটি 'ই' যুক্ত হয়েছে।

বলঙ (বন, জঙ্গল) শব্দটিও 'বন' শব্দ থেকে এসেছে বলা যায়। বনং- বলঙ।

সব ভাষারই শব্দভান্ডারের ইতিহাস এক রকম। প্রাচীন ক্ল্যাসিক্যাল কোনও একটি বা একাধিক ভাষা থেকে এসেছে তার প্রাথমিক অধিকাংশ শব্দ। তার পরে শব্দ এসেছে বহু ভাষা থেকে।

ককবরকের কোনও ক্ল্যাসিক্যাল উত্তরাধিকার নেই। তবু স্বাভাবিক ভাবেই বাংলার মাধ্যমে সংস্কৃতের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে তার। তাছাড়াও, এখন খুলে যাচ্ছে নানা জানালা। দূরদর্শনের দৌলতে হিন্দী আজ এসে পড়েছে ঘরের মধ্যে প্রায়। ককবরকও তার প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। এখন ককবরক ক্রমেই অধিকতর বিষয়ে ব্যবহৃত হবে। শব্দের প্রয়োজন হবে, শব্দ আসবে ও শব্দভান্ডার ক্রমেই বৃহৎ ও বৃহত্তর হয়ে উঠবে।

(৪) ব্যাকরণ

৪.০ মানুষের ভাষা ফুসফুস থেকে উঠে আসা হাওয়ার সাহায্যে মুখ ও নাক দিয়ে উচ্চারিত ধ্বনি-শৃঙ্খলের সমষ্টি মাত্র। একাধিক ধ্বনি একত্রিত হয়ে গঠন করে শব্দ। একাধিক শব্দ অন্বয় যুক্ত হয়ে গড়ে তোলে বাক্য। বাক্যই ভাষার একক। তুলনামূলক ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য ভাষা শিক্ষা ও শিক্ষণের প্রয়োজনীয় দিগদর্শন দেওয়া। সুতরাং এই ধরণের গবেষণায় ব্যাকরণই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়টিকে পৃথক রাখা হয়েছে আলোচনার সুবিধার জন্য। এতে বিষয়ঘটিত কোন ব্যত্যয় ঘটেনি।

৪.১ বিশেষ্য।

বিশেষ্য সংজ্ঞা নির্দেশক শব্দ। ব্যক্তি, প্রাণী, বস্তু, গুণ, অবস্থা ইত্যাদি সংজ্ঞা নির্দেশক শব্দকে বিশেষ্য বলে। ককবরক ও বাংলায় বিশেষ্যের ব্যবহার মোটামুটি এক রকম। বিশেষ্য বহুবচন চিহ্ন ধারণ করে, এর লিঙ্গান্তর হয়, বাক্যে বিশেষ্য সাধারণতঃ কর্তা বা কর্ম হয়।

৪.১.১ বিশেষ্যের গঠনগত শ্রেণী বিভাগ।

গঠনের বিচারে বিশেষ্যকে (১) সিদ্ধ ও (২) সাধিত , এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যে শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে অর্থহীন হয়ে পড়ে সেটি সিদ্ধ আর অন্যগুলি সাধিত বিশেষ্য।

৪.১.২ বাংলা সিদ্ধ বিশেষ্যের উদাহরণ।

সূর্য, চন্দ্র, ভক্তি, হাত, জমিন, ফুল, বেউকুফ, কোর্ট ইত্যাদি।

ককবরক সিদ্ধ বিশেষ্যের উদাহরণ ঃ

সাল (সূর্য), খুম (ফুল), নগ (ঘর), হা (মাটি, দেশ), রি, (কাপড়), তাল (চন্দ্র), তক (পাখী), সিঙা (সিংহ), ইয়ার.(বন্ধু), পঞ্চাইত (পঞ্চায়েত), ইত্যাদি।

৪.১.৩: সাধিত বিশেষ্য দুই প্রকারের ঃ (ক) প্রত্যয় নিষ্পন্ন ও (খ) সমস্ত।

(ক) বাংলা প্রত্যয় নিষ্পন্ন বিশেষ্যের উদাহরণ ঃ ছেলেমি = ছেলে + মি,

রাখালি = রাখ + আল + ই

হাতল = হাত + ল

ককবরক প্রত্যয় নিষ্পন্ন বিশেষ্যের উদাহরণ ঃ

মৌরীগনায় - (পাহারাদার) = মৌরীগ (রক্ষা করা) + নায় (কারী)

রাঙগীনাঙ-(ধনবান) = রাঙ (টাকা) + গীনাঙ (বান)

চামুঙ (খাদ্য) = চা (খা) + মুঙ (ক্রিয়াকে বিশেষ্য করার প্রত্যয়)

হাময়া (খারাপ) = হাম (ভালহ') + য়া (নঞর্থক প্রত্যয়)

বাংলার তুলনায় ককবরকে প্রত্যয় ও নিষ্পন্ন শব্দের সংখ্যা কম।

(খ) বাংলা সমস্ত বিশেষ্যের উদাহরণ ঃ

চাঁদমুখ, রান্নাঘর, হাতপাখা, জলভাত, শুকনামাছ ইত্যাদি।

ককবরকে সমস্ত বিশেষ্যের উদাহরণ ঃ

খুমতাঙ (মালা) = খুম (ফুল) + তাঙ (সুতা)

মতাইনগ (মন্দির) = মতাই (দেবতা) + নগ (ঘর)

মকলনুগয়া (অন্ধ) = মকল (চোখ) + নূগ (দেখ) + য়া (নঞর্থক প্রত্যয়)

বীখাকতর (সাহসী) = বীখা (বুক) + কতর (বড়)

সেঙকৌরাক (বীর) = সেঙ (তলেঅয়ার) + কৌরাক (শক্ত)

৪.১.৩.১ ককবরক সাধিত বিশেষ্যগুলির মধ্যে এক শ্রেণীর শব্দ পাই যেগুলি ঠিক প্রত্যয় নিষ্পন্নও নয় বা সমস্ত পদও নয়। এগুলিকে ব-বিশেষ্য বলতে পারি। নীচে এই শ্রেণীর বিশেষ্যের ক'টি উদাহরণ দেওয়া গেল।

বীফাঙ - গাছ ঃ থাইলিক ফাঙ - কলাগাছ

বিহিক - স্ত্রী ঃ আনিহিক - আমার স্ত্রী

বীফা - বাবা ঃ আফা - আমার বাবা

নীফা - তোমার বাবা

বীমা-মা ঃ আমা-আমার মা

নীমা-তোমার মা

রীতুই-ডিম ঃ তকতুই-মুরগীর ডিম

গাছ স্ত্রী, বাবা, মা, ডিম ইত্যাদি সাধারণ শ্রেণির বিশেষ্যের আদিতে একটি ব-ধ্বনি যুক্ত আছে- বীফাঙ, বিহিক, বীফা, বীমা, রীতুই। এগুলি যখন সাধারণ শ্রেণী থেকে বিশেষ শ্রেণীতে আসে তখন আর এই ব-ধ্বনিটি থাকে না। এই সাধারণ শ্রেণির বিশেষ্যগুলিকে ব-বিশেষ্য বলতে পারি।

৪.২ লিঙ্গ (সির)।

বিশেষ্যের লিঙ্গ প্রকরণ ককবরক ও বাংলায় প্রায় হুবুহু এক রকম। প্রাণী বাচক বিশেষ্যের যেগুলি দিয়ে পুরুষ বোঝায় সেগুলি পুংলিঙ্গ (সির চৌলা)। যেমন ঃ বাবা (বীফা), মানুষ (বরক), যুবক (সিকলা), শ্বশুর (কৌরা)। যেগুলি দিয়ে স্ত্রী বোঝায় সেগুলি স্ত্রীলিঙ্গ (সির বৌরৌই)। যেমন ঃ মা (বীমা), স্ত্রীলোক (বৌরৌই), যুবতী (সিকলি), শাশুড়ি (কৌরাজুক)। যেগুলি দিয়ে স্ত্রী বা পুরুষ কোনোটিই পরিষ্কার বোঝায় না, যে কোনোটাই হতে পারে, সেগুলিকে উভয়লিঙ্গ (সিরনৌই) বলি। যেমন ঃ শিশু (চেরাই), গরু (মুসুক), মোরগ (তক), হাঁস (তাখুম)। বাকি সমস্ত প্রাণী বাচক ও অপ্রাণী চাবক বিশেষ্য ক্লীবলিঙ্গ (সিরগুরমা)।

বাংলা বা ককবরক কোনও ভাষায়ই সর্বনামের লিঙ্গ বিভাগ নেই। ত্রিপুরার কথ্য বাংলায় ইংরেজী he এবং she এর অনুরূপ 'হিতে/তে' এবং 'তাই' সর্বনাম দুটির চলন আছে। মান্য (standard) বাংলায় এগুলি নেই।

(২) সংখ্যার উল্লেখ না থাকলেও বক্তা এক বচনই ব্যবহার করেন।

গাছ ছায়া দেয়	বীফাঙ সামপ্লি রীঅ।
মানুষ আসে যায় বরক ফাইঅ,	থাঙগ।
বড় বাড়ী ভাল, ছোট ভাল নয়	নগ কতর কাহাম, কচু কাহাম আঁঙিগয়া।

(৩) যখন বক্তা সংখ্যার উল্লেখ না করেও বোঝাতে চান যে কথিত বস্তু বা ব্যক্তির সংখ্যা একের বেশী, তখনই বহু বচন ব্যবহার হয় বাংলায় ও ককবরকে।

আমগুলি মিষ্টি	থাইচুকরগ কথক।
গরুগুলি সুন্দর	মুসুকরগ নাইথক।
মহিলারা যাচ্ছেন	বীরাইসঙ থাঙগই তঙগ।

৪.৩.১ বাংলায় বহুবচন বোঝাবার জন্য বিশেষ্যটির শেষে একটি প্রত্যয় যুক্ত হয়। সুনীতি কুমার (চট্টোপাধ্যায়-১৯৩৯/৮৯, পৃ-২০৯) অনেকগুলি বহুবচন দ্যোতক প্রত্যয়ের উল্লেখ করেছেন। তারমধ্যে আছে -রা, এরা, গুলি, গুলা, গন, জন, বৃন্দ, সকল, বর্গ, সমূহ ইত্যাদি। এই প্রত্যয়গুলির ব্যবহারের নিয়ম বেশ নমনীয়।

(১) রা, এরা ব্যবহার হয় প্রাণিবাচক বিশেষ্যের সঙ্গে। যেমনঃ ছেলেরা, মেয়েরা, বাঘেরা, পন্ডিতেরা।

(২) গুলি গুলা, ব্যবহার হয় প্রায় সব রকম বিশেষ্যের সঙ্গে। তবে অভিজাত, শ্রদ্ধাভাজন বা উচ্চশ্রেণীর মানুষের বা দেবতার ক্ষেত্রে-গুলি বা গুলা ব্যবহার হয় না। উদাহরণ ঃ গরুগুলি, ছেলেগুলি, বাড়ীগুলি।

(৩) গণ, জন, বৃন্দ, বর্গ, প্রাণীবাচক বিশেষ্যর সঙ্গে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ ঃ গুণিগণ, প্রাণিগণ, বিদ্বজ্জন, পন্ডিতজন, ছাত্রবৃন্দ, কর্মিবৃন্দ, প্রাণীবর্গ, শিক্ষকবর্গ।

(৪) সকল ও সমূহ প্রায় সব জায়গাতেই ব্যবহার করা যায়। উদাহরণঃ মনুষ্যসকল, বৃক্ষসকল, লোক সমূহ, অট্টালিকা সমূহ।

(৫) এছাড়াও বাংলায় আরও অনেক বহু বচন দ্যোতক প্রত্যয় আছে। তবে সেগুলির ব্যবহার কুব কম জায়গাতেই হয়।

৪.৩.২ ককবরকে বহুবচন দ্যোতক প্রত্যয়টি বাংলার মতই বিশেষ্যটির শেষে যুক্ত হয়। কিন্তু ককবরকে বহু বচন দ্যোতক প্রত্যয় মাত্র দুটি -রগ এবং -সঙ। রগ প্রত্যয়টি প্রাণী অপ্রাণী নির্বিশেষে সকল বিশেষ্যের সঙ্গেই ব্যবহৃত হয়। -সঙ প্রত্যয়টি ব্যবহৃত হয় কেবল মনুষ্য বাচক বিশেষ্যের সঙ্গে। নীচের উদাহরণগুলিতে বিষয়টা পরিষ্কার হবে।

এক বচন (সুকসা)	বহু বচন (সুকবাঙ)
মানুষ - বরক	মানুষেরা - বরকরগ, বরকসঙ
শিক্ষক-ফীরীঙনায়	শিক্ষকগণ-ফীরীঙনায়রগ, ফীরীঙনায়সঙ
বন্ধু -কিচিঙ	বন্ধুবর্গ-কিচিঙরগ, কিচিঙসঙ
গরু-মুসুক	গরুগুলি-মুসুকরগ
পথ-লামা	পথগুলি-লামারগ
টেবিল-তেবিল	টেবিলগুলি-তেবিলরগ

বাংলায় 'অনেক' ও 'বহু' শব্দগুলো যোগেও বহুবচন করা হয়। ককবরকে 'অনেক' ও 'বহু' বোঝাতে 'কীবাঙ' শব্দ ব্যবহার করা হয়।

অনেক মানুষ - বরক কীবাঙ

অনেক গরু- মুসুক কীবাঙ

বহু/ অনেক জিনিস-মানাই কীবাঙ

৪.৪ পদাশ্রিত - নির্দেশক (Enclitic Definitives: Articles)

৪.৪.১ বাংলায় টা, টি, টুকু, খানি, খানা, জন, গাছা, গাছি, ইত্যাদি কতকগুলি

শব্দ বা শব্দাংশ আছে যেগুলি বিশেষ্যের সঙ্গে বা বিশেষ্যের পূর্বে ব্যবহৃত সংখ্যাবাচক বিশেষণটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিশেষ্যটির গুণ বা প্রকৃতি নির্দেশ করে। 'এইরূপ' শব্দ বা শব্দাংশকে পদাশ্রিত নির্দেশক বলা যাইতে পারে।' সুনীতি কুমার (চট্টোপাধ্যায়-১৯৩৯/৮৯, পৃ-২১৬)।

বাংলায় বেশ কয়েকটি পদাশ্রিত নির্দেশক শোনা যায়। তার মধ্যে খানা, খানি, গাছা, গাছি, গোটা, জন, টা, টি, টুকু, তা, থান, বেশী প্রচলিত। বাড়ীখানা, ঘরখানি, লাঠিগাছা, পৈতাগাছি, গোটা তিনেক টাকা, দুইজন লোক, গরুটা, লোকটি, দুধটুকু, তিন তা কাগজ, দুই থান কাপড়—এইভাবে এগুলি ব্যবহার হয়। বেশীর ভাগ পদাশ্রিত নির্দেশক বিশেষ্যটির সঙ্গে ব্যবহৃত হয়। যেমন-বাড়ীখানা। কিন্তু বিশেষ্যটির আগে সংখ্যাবাচক শব্দ থাকলে নির্দেশকটি তার সঙ্গে যায়। যেমন-চারখানা বাড়ী। কোনও কোনও সময় কোনও কোনও নির্দেশক সংখ্যাবাচক শব্দটির আগেও ব্যবহৃত হয়। যেমন-খান চারেক বাড়ী। তবে এইভাবে সবগুলিকে ব্যবহার করা যায় না। দু' একটি নির্দেশক আছে যেগুলি বিশেষ্যটির সঙ্গে ব্যবহৃত হয় না। 'জন' এমন একটি নির্দেশক। এ-কটি সবসময় সংখ্যাবাচক শব্দটির সঙ্গে যায়। যেমন-একজন লোক। 'লোকজন' বা 'মানুষজন' বললে অন্য অর্থ হয়।

৪.৪.২ ককবরকেও পদাশ্রিত নির্দেশক আছে। এগুলিও বিশেষ্যটির গুণ বা প্রকৃতি নির্দেশ করে। তবে ককবরকে এগুলি ব্যবহার করার নিয়ম খুব সরল। নির্দেশকটি সর্বদা সংখ্যাবাচক শব্দটির সঙ্গে বসে। ককবরকে বিশেষণ বিশেষ্যের পরে বসে। সুতরাং সংখ্যাবাচক শব্দটি বিশেষ্যের পরে বসে। নির্দেশকটি তার সঙ্গে বসে। ককবরকের পদাশ্রিত নির্দেশকগুলি অনেক ক্ষেত্রেই মূল বিশেষ্যটির অংশবিশেষ। অথবা বিশেষ্যটির প্রতিধ্বনি মূলক কোনো শব্দ। নীচের উদাহরণগুলিতে বিষয়টা পরিষ্কার হবে।

(১) শরীরের তিল বোঝাতে 'কক' ব্যবহৃত হয়।

সবাই ককসা -তিল একটা-একটা তিল।

(২) হাত, পা, আঙ্গুল, লাঠি, মরাগাছ, বাঁশ বা বাঁশ ও কাঠের

তৈরী লম্বা জিনিস বোঝাতে 'কঙ' ব্যবহৃত হয়।

ওআ কঙসা - বাঁশ একটা -একটা বাঁশ।

লাথা কঙনাই-লাঠি দু'খানা-দু'খানা লাঠি।

কলম কঙথাম-কলম তিনটি-তিনটি কলম।

(৩) ছোট, গোল জিনিসের ক্ষেত্রে 'কল' যোগ হয়।

মকল কলসা-চোখ একটা- একটা চোখ।

মায়ুরুঙ কলনাই-চা(উ)ল দু'টো-দু' টো চা(উ)ল।

৪। সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত পদাশ্রিত নির্দেশক হচ্ছে 'কাই'। সংখ্যা গোণার সময় কাইসা, কাইনাই, এইভাবে গোণা হয়। যে সব বিশেষ্যের সঙ্গে ব্যবহারের নির্দেশক স্পষ্ট করে জানা নেই তাদের সঙ্গে 'কাই' ব্যবহৃত হয়। নতুন প্রজন্মের বক্তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'কাই' ব্যবহার করছে।

(৪) চ্যাপটা, পাতলা কোনো জিনিস, যেমন কাপড়, বই, খাতা, এগুলির ক্ষেত্রে 'কাঙ' ব্যবহৃত হয়।

রিগনাই কাঙসা-শাড়ী একটা-একটা শাড়ী।

বই কাঙনাই-বই দু'খানা-দু'খানা বই।

(৬) টাকার সঙ্গে আসে 'খক'

নাঙ খকসা-টাকা একটা-একটা টাকা।

(৭) পান করার বেলায় 'খপ' ব্যবহৃত হয়।

দুমা খপসা-ধোঁয়া একটান-একটান তামাক।

চা খপনাই-চা দুই চুমুক-দুই চুমুক চা।

(৮) 'খরক' ব্যবহার হয় মানুষের ক্ষেত্রে।

খরক খরকসা-মানুষ একজন-একজন মানুষ।

বীরাই খরগনাই-স্ত্রীলোক দুইজন-দুইজন মহিলা।

চেরাই খরকথাম-শিশু তিনজন-তিনটি শিশু।

(৯) ঘর, নৌকা, ইত্যাদির সঙ্গে বসে 'খুঙ'।

রুঙ খুঙসা-নৌকা একটা-একটা নৌকা।

নগ খুঙনাই-ঘর দুইটা-দুইটা ঘর।

(১০) মালা বা মালার মত করে সাজানো জিনিসের সঙ্গে আশে 'তাঙ'।

খুমতাঙ তাঙসা-মালা একটা -একটা মালা।

থাইলিক বীতাঙ তাঙনীয়-কলা কাদি দুইটা-দুই কাদি কলা।

(১১) 'তুই' ব্যবহার করা হয় ডিমের সঙ্গে।

বুতুই তুইসা-ডিম একটা-একটা ডিম।

(১২) 'তুঙ' ব্যবহার হয় সরু, লম্বা জিনিসের ক্ষেত্রে।

খুতুঙ তুঙসা-সুতা একটা-একটা সুতা।

বীখীনাই তুঙনাই-চুল দুইটা-দুইটা চুল।

(১৩) ফল বা বড় গোল জিনিস বোঝাতে 'থাই' ব্যবহার করা হয়।

থাইপুঙ থাইসা-কাঁঠাল একটা-একটা কাঁঠাল।

বল থাইনাই-বল দুইটা-দুইটা বল।

(১৪) শাখা বোঝাতে 'দেক' বা 'দেঙ' ব্যবহৃত হয়।

বীফাঙনি বেদেক দেকসা-গাছের ডাল একটা।

ব্যাঙকনি বেদেক দেঙনাই-ব্যাঙের দুইটি শাখা।

(১৫) মাছ বা মাংসের টুকরা বোঝাতে 'ফন' ব্যবহার হয়।

আ ফনসা-মাছ এক টুকরা।

বাহান ফননাই-মাংস দুই টুকরা।

(১৬) 'ফাঙ' বলে জীবিত গাছ বোঝাতে।

বীফাঙ ফাঙসা-গাছ একটা।

(১৭) মদ তৈরী করতে যে বড়ি লাগে তার সঙ্গে আসে 'ফিল'।

চীআন ফিলসা-চুয়ান একটা।

(১৮) থাম্বড় শব্দের সঙ্গে 'ফুঙ' ব্যবহার করা হয়।

থাপরা ফুঙসা-থাম্বড় একটা।

(১৯) ফুল এর সঙ্গে 'বার' ব্যবহৃত হয়।

বুনার বারসা-ফুল একটা।

খুম বারনাই-ফুল দুটি।

(২০) 'মা' ব্যবহার করা হয় জন্তু বোঝাতে।

মুমুক মাসা-গরু একটা।

মহিমুঙ মাথাম-হাতি তিনটা।

'মা' অনেক সময় 'শিশু' শব্দের সঙ্গেও এসে যায়।

চেরাই মাসা-শিশু একটি।

(২১) পাতা বোঝাতে 'লাই' ব্যবহৃত হয়।

বীলাই লাইসা-পাতা একটা।

(২২) চামড়া, কাগজ বা কাপড়ের টুকরা বোঝাতে, 'লাপ' ব্যবহার করা হয়।

খুকুর লাপসা-চামড়া একটা।

কাগজ লাপনাই-কাগজ দুই টুকরা।

(২৩) 'লাম' বলে ছিদ্র, জানালা ইত্যাদির ক্ষেত্রে।

বীলাম লামসা - ছিদ্র একটা।

দগলাম লামনাই-জানালা দুইটা।

(২৪) পয়সা, পিঠে, ইত্যাদির ক্ষেত্রে 'লেপ' বসে।

পুইসা লেপসা-পয়সা একটা।

আউান লেপনাই-পিঠে দুখানা।

৪.৫ কারক ও বিভক্তি

বাক্যের অন্তর্গত ক্রিয়াপদের সঙ্গে বিশেষ্য বা সর্বনামের সম্পর্ককে কারক বলে। যে ধ্বনি বা ধ্বনি-সমষ্টি ব্যবহার করে কারক বোঝানো হয় সেগুলিকে বিভক্তি বলে।

৪.৫.১ বাংলায় কারক ছয় প্রকার বলে ধরা হয়। কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ। বাংলায় সম্বন্ধ পদও আছে।

৪.৫.২ আমাদের মতে ককবরকে কারক পাঁচ প্রকার। 'সম্প্রদান'কেও আমরা কর্ম বলেই ধরেছি। ককবরকেও সম্বন্ধ পদ আছে।

৪.৫.৩ বাংলা ও ককবরক কারকের এক বচনে ব্যবহৃত বিভক্তি চিহ্নগুলি নীচে দেওয়া গেল।

কারক	বিভক্তি চিহ্ন বাংলা	বিভক্তি চিহ্ন ককবরক
কর্তৃ	শূন্য	শূন্য
কর্ম	কে	ন
করণ	দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক	বাই
সম্প্রদান	কে	-
অপাদান	থেকে, হইতে	নি, নি সিমি
অধিকরণ	এ,য়,তে	অ
সম্বন্ধ পদ	র, এর	নি

উল্লিখিত কারক ও বিভক্তি চিহ্নগুলি সম্পর্কে কিছু মন্তব্য প্রয়োজন। বাংলার সাধারণ বিভক্তি চিহ্নগুলি এখানে দেওয়া হয়েছে। বাংলায় এর ব্যতিক্রমও আছে। কিন্তু ককবরকে ঐগুলিই বিভক্তি চিহ্ন। কোনো ব্যতিক্রম নেই। বাংলায় উপরে লিখিতগুলি ছাড়াও যে সব বিভক্তি চিহ্ন হয় সেগুলিরও একবচন রূপ নীচে দেওয়া গেল —

কর্তৃ - এ, য়ে, য়, এতে।

কর্ম - শূন্য, রে, এরে।

করণ - এ, তে, এতে, হইতে, হ'তে।

সম্প্রদান - র, তরে, র + জন্য।

অপাদান - অপেক্ষা

অধিকরণ - র + কাছে, নিকটে, মধ্যে ইত্যাদি।

সম্বন্ধপদ - কার।

৪.৫.৪ শব্দরূপ । নীচে 'মানুষ'-'বরক' শব্দটির রূপ দেওয়া গেল।

কারক	একবচন		বহু বচন	
	বাংলা	ককবরক	বাংলা	ককবরক
কর্তৃ	মানুষ	বরক	মানুষেরা	বরকরগ
কর্ম	মানুষকে	বরকন'	মানুষদিগকে	বরকরগন'
করণ	মানুষ দ্বারা	বরকবাই	মানুষদিগ দ্বারা	বরকরগবাই
সম্প্রদান	মানুষকে	বরকন'	মানুষদিগকে	বরকরগন'
অপাদান	মানুষ হ'তে	বরকনিসিমি	মানুষদিগ হ'তে	বরকরগনিসিমি
অধিকরণ	মানুষে	বরক'	মানুষদিগে	বরকরগ'
সম্বন্ধপদ	মানুষের	বরকনি	মানুষদিগের	বরকরগনি

৪.৬ বিশেষণ

"যে শব্দের দ্বারা নামের বা ক্রিয়ার, বা অন্য কোনও বিশেষণের গুণ বা ধর্ম, কার্য্য বা অবস্থা বিষয়ে বিশিষ্টতা প্রকটিত হয, তাহাকে বিশেষণ বলে।"-সুনীতি কুমার (চট্টোপাধ্যায়-১৯৩৯/৮৯, পৃঃ ১২৯)। বাংলার তুলনায় ককবরকে বিশেষণের সংখ্যা কম। তবে ভাল -কাহাম, মন্দ-হামরা, লম্বা-কলক, বেঁটে-বারা, ভারী-হিলিক, হাল্কা-হেলেঙ, ইত্যাদি সাধারণ বিশেষণ ককবরকেও আছে। প্রয়োজনে বাংলা বিশেষণ নির্দ্বিধায় ককবরকে ব্যবহৃত হয়। যেমনঃ উল্টা-উলতা, সব-বিবাক, জত্ত ইত্যাদি। ককবরকে মনের উচ্ছ্বাস প্রকাশক বিশেষণ-যেমন বিস্ময়কর, অপার্থিব , চমৎকার, ইত্যাদি -নেই। অবশ্য বাংলায়ও এগুলির বেশীর ভাগই তৎসম বা বিদেশী।

বাংলা সহ উত্তর ভারতের সমস্ত সংস্কৃতজ ভাষায় এবং দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় ভাষাগুলিতে বাক্যে বিশেষণটি বিশেষ্যের আগে আসে। ককবরকে বিশেষণটি বিশেষ্যের পরে আসে। যেমন-

তখিরায় চেরাই কাহাম।

তখিরায় ছেলে ভাল - তখিরায় ভাল ছেলে

তবে বিশেষণটি যদি মূলতঃ বিদেশী হয় তবে সেটি বিশেষ্যের আগেও বসতে পারে, পরেও বসতে পারে। যেমন -

কক উলতা তা সদি।

কথা উল্টা না বলো - উল্টা কথা বলো না।

উলতা কক তা সাদি।

উল্টা কথা না বলো - উল্টা কথা বলো না।

ককবরকের ক্রিয়া বিশেষণ ও বিশেষণের বিশেষণগুলি বাংলার মতই ক্রিয়া বা বিশেষণটির আগে আসে। যেমন-

(১) ব দাকতি থাঙখা।

সে তাড়াতাড়ি গিয়েছে।

(২) নিনি নগ বেলাই নাইথক।

তোমার বাড়িটি খুব সুন্দর।

৪.৬.১ বিশেষণের গঠনগত শ্রেণী বিভাগ

গঠনের বিচারে বিশেষণকে (১) সিদ্ধ ও (২) সাধিত এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যে শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে অর্থহীন হয়ে পড়ে সেটি সিদ্ধ, আর অন্যগুলি সাধিত বিশেষণ।

(১) সিদ্ধ বিশেষণের উদাহরণ।

বাংলা-বড়, ছোট, ভাল।

ককবরক-অকরা (বড়), কুচু (ছোট), বিবাক (সব), হুইচার (সতর্ক)।

(২) সাধিত বিশেষণ দুই প্রকার হতে পারে। (ক) প্রত্যয় নিষ্পন্ন ও (খ) সমস্ত। উদাহরণ নীচে দেওয়া গেল।

(ক) প্রত্যয় নিষ্পন্ন বিশেষণ ঃ

বাংলা - ক্রীত = ক্রী + ত, লিখিত = লিখ্ + ত

ককবরক - পাইজাক (ক্রীত) = পাই (কেনা) + জাক (প্রত্যয়)

সাইজাক (লিখিত) = সাই (লেখা) + জাক (প্রত্যয়)

(খ) সমস্ত বিশেষণ ঃ

বাংলা - সদ্যজাত, অসত্য, পরলোকগত।

ককবরক - নাইথক (সুন্দর) = নাই (দেখা) + (ক) থক (মিষ্টি)।

তত্তথক (খুশী) = তত্ত (হওয়া) + (ক) থক (মিষ্টি)।

৪.৬.১.১গঠনের বিচারে ককবরকে আরও একটি শ্রেণীর বিশেষণ শোনা যায়। এগুলিকে সিদ্ধ বা সাধিত কোনও শ্রেণীতেই ধরা যায় না। এগুলিকে ক-বিশেষণ

বলতে পারি। এগুলি উপরে (৪.১.৩.১) অনুচ্ছেদে বর্ণিত ব বিশেষ্যের সমগোত্রীয় বলতে পারি। এই শ্রেণীর বিশেষণগুলির প্রথমে একটি ক-ধ্বনি থাকে। ক-ধ্বনিটি বাদ দিলে প্রত্যেকটি বিশেষণই একটি ক্রিয়াপদ হয়ে যায়।

উদাহরণ ঃ কলক-লম্বা, লক-লম্বা হ (ওয়া) কতর-বড়, তর-বড়হ।

কাহাম-ভাল, হাম-ভাল হ। কাচাঙ-ঠান্ডা, চাঙ-ঠান্ডা হ।

কিসি-ভিজা, সি-ভিজে যা। কুতুঙ-গরম, তুঙ-গরম হ।

৪.৬.২ বাংলা বা ককবরকে বিশেষণ বচনের চিহ্ন ধারণ করে না। কদাচিৎ এই নিয়মের ব্যতিক্রম অবশ্য দেখা যায়। বিশেষ্যটি উল্লেখ না করে কেবল বিশেষণটি দিয়ে বাক্য গঠন করলে বিশেষণও বচন চিহ্ন ধারণ করে। দুটি ভাষাতেই এক নিয়ম। যেমন -

বড়গুলি তুমি নিয়ে যাও ছোটগুলি ওকে দাও।

কতর রগ নৌঙ নাদি কুচুরগ বন' রৌদি।

বাংলায় ও ককবরকে সাধারণতঃ বিশেষণের লিঙ্গান্তর হয় না। তবে বাংলায় বিশেষণকে পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন- সুন্দর হলে সব পোষাকেই মানায়। সুন্দরীদের একটু দেমাক থাকেই।

ককবরকে বিশেষণের সঙ্গে লিঙ্গ বাচক প্রত্যয় যোগ করে বিশেষ্য হিসাবে ব্যবহার করা যায়। যেমন-অকরা(বড়), অকরাসা (বয়স্ক পুরুষ), অকরামা (বয়স্কা মহিলা), কসম (কালো), কসমসা (কৃষ্ণকায় লোক) কসমমা (শ্যামলী মেয়ে/ মহিলা)।

৪.৬.৩ তুলনামূলক বিশেষণ

চলতি বাংলায় তুলনা মূলক বিশেষণ নেই। তর, তম, যুক্ত বিশেষণ চলতি বাংলায় ব্যবহৃত হয় না। বিশেষণের সঙ্গে কিছু যোগ না করে চেয়ে, থেকে, অপেক্ষা, ইত্যাদি অনুসর্গ ব্যবহার করে বা কিছু ব্যবহার না করে বাংলায়

উৎকর্ষ, অপকর্ষ বোঝানো হয়।

উদাহরণ - রামের চেয়ে শ্যাম ভালো।

হরিণ থেকে বাঘ দ্রুতগামী।

ভগবানের বড় কেউ নেই।

ককবরকেও - তর, -তম, এর অনুরূপ কিছু নেই। অনুসর্গ ব্যবহার করেই উৎকর্ষ অপকর্ষ বোঝানো হয়। ককবরকে অনুসর্গ ব্যবহার না করে তুলনা করা যায় না।

উদাহরণ ঃ রামনি সাই শ্যাম কাহাম।

রামের চেয়ে শ্যাম ভালো।

মুসুই সাই মসা দাকতি খাঙগ।

হরিনের চেয়ে বাঘ তাড়াতাড়ি যায়।

কাইথরনি সাই কতর কেব' কৌরাই।

ভগবানের চেয়ে বড় কেউ নেই।

৪.৭ সংখ্যা

৪.৭.১ বাংলায় গণনা পদ্ধতি দশমিক। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয় দশ, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর, আশি, নব্বই, (এক)শ'। গোণার সময় প্রথমে একক সংখ্যাটি, পরে দশের গুণিতকটি বলা হয়। তবে বলার সময় সব স্পষ্ট বোঝা যায় না। যেমন-এগারো, বারো, তেরো, পনেরো, সতেরো ও আঠারো সংখ্যাগুলিতে 'দশ' শব্দটি 'আরো' তে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। এক, দুই ইত্যাদি শব্দগুলিও বদলে গেছে। বারো, বাইশ, বত্রিশ, বিয়াল্লিশ, বাহান্ন বাষট্টি, বাহাত্তর, বিরাশী, বিরানব্বই - এই শব্দগুলিতে 'দুই' শব্দটি 'ব', 'বা', 'বি' ইত্যাদিতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। ঊনিশ, ঊনত্রিশ, ঊনচল্লিশ, ঊনপঞ্চাশ, ঊনষাট, ঊনসত্তর, ঊনআশি ও ঊননব্বই গোনার নিয়ম অন্যরকম। এগুলিতে বিশ থেকে এক কম, ত্রিশ থেকে এক কম, ইত্যাদি বলা হয়। নিরানব্বই

আবার এই নিয়মেরও ব্যতিক্রম। তাহলেও মোটামুটি ভাবে বাংলার গণনা পদ্ধতিতে প্রথমে একক ও পরে দশের গুণিতকটি আসে বলা যায়।

৪.৭.২ ককবরক গণনা পদ্ধতি একাধারে দশমিক ও বিংশতিক। একুশ থেকে নিরানব্বই পর্যন্ত গোণার সময়ে প্রথমে বিশের গুণিতকটি, পরে দশ, ও সব শেষে একক সংখ্যাটি বলা হয়। এখানে কোথাও কোনো অস্পষ্টতা নেই।

নীচে সংখ্যা শব্দগুলি দেওয়া গেল

সা	-	এক
নাই	-	দুই
থাম	-	তিন
ব্রুই/বারাই	-	চার
বা	-	পাঁচ
দক	-	ছয়
সিনি	-	সাত
চার	-	আট
চুকু	-	নয়
চি	-	দশ
চিসা	-	দশ এক -এগারো
চিনাই	-	দশ দুই - বারো
চিথাম	-	দশ তিন- তেরো
চিব্রুই	-	দশ চার চৌদ্দ
চিবা	-	দশ পাঁচ- পনেরো
চিদক	-	দশ-ছয়-ষোল

চিসিনি	-	দশ-সাত-সতেরো
চিচার	-	দশ আট- আঠারো
চিচুকু	-	দশ নয়-ঊনিশ
খলপে	-	এক বিশ-বিশ
খলপে সা	-	এক বিশ এক-একুশ
খলপে নাই	-	এক বিশ দুই - বাইশ
খলপে থাম	-	এক বিশ তিন - তেইশ
খলপে ব্রুই	-	এক বিশ চার - চব্বিশ
খলপে বা	-	এক বিশ পাঁচ- পঁচিশ
খলপে দক	-	এক বিশ ছয়- ছাব্বিশ
খলপে সিনি	-	এক বিশ সাত - সাতাশ
খলপে চার	-	এক বিশ আট - আটাশ
খলপে চুকু	-	এক বিশ নয় - ঊনত্রিশ
খলপে চি	-	এক বিশ দশ - ত্রিশ
খলপে চিসা	-	এক বিশ দশ এক - একত্রিশ
খলপে চিনাই	-	এক বিশ দশ দুই-বত্রিশ
খলপে চি থাম	-	এক বিশ দশ তিন - তেত্রিশ
খলপে চিব্রুই	-	এক বিশ দশ চার - চৌত্রিশ
খলপে চি বা	-	এক বিশ দশ পাঁচ - পঁয়ত্রিশ
খলপে চি দক	-	এক বিশ দশ ছয়-ছত্রিশ
খলপে চি সিনি	-	এক বিশ দশ সাত-সাঁইত্রিশ

খলপে চি চার	-	এক বিশ দশ আট - আটত্রিশ
খলপে চি চুকু	-	এক বিশ দশ নয় - ঊনচল্লিশ
খলনাই	-	দুই বিশ- চল্লিশ
খলনাই সা	-	দুই বিশ এক - একচল্লিশ
খলনাই নাই	-	দুই বিশ দুই - বিয়াল্লিশ
খলনাই থাম	-	দুই বিশ তিন- তেতাল্লিশ
খলনাই ব্রুই	-	দুই বিশ চার-চুয়াল্লিশ
খলনাই বা	-	দুই বিশ পাঁচ - পয়ঁতাল্লিশ
খলনাই দক	-	দুই বিশ ছয় - ছেচল্লিশ
খলনাই সিনি	-	দুই বিশ সাত- সাতচল্লিশ
খলনাই চার	-	দুই বিশ আট-আটচল্লিশ
খলনাই চুকু	-	দুই বিশ নয়-ঊনপঞ্চাশ
খলনাই চি	-	দুই বিশ দশ- পঞ্চাশ
খলনাই চিসা	-	দুই বিশ দশ এক- একান্ন
খলনাই চি নাই	-	দুই বিশ দশ দুই - বাহান্ন
খলনাই চি থাম	-	দুই বিশ দশ তিন-তিপ্পান্ন
খলনাই চি ব্রুই	-	দুই বিশ দশ চার - চুয়ান্ন
খলনাই চি বা	-	দুই বিশ দাশ পাঁচ - পঞ্চান্ন
খলনাই চি দক	-	দুই বিশ দশ ছয়- ছাপ্পান্ন
খলনাই চি সিনি	-	দুই বিশ দশ সাত-সাতান্ন
খলনাই চি চার	-	দুই বিশ দশ আট- আটান্ন

খলনাই চি চুকু	-	দুই বিশ দশ নয় - ঊনষাট
খল থাম	-	তিন বিশ - ষাট
খলথাম সা	-	তিন বিশ এক - একষট্টি
খলথাম নাই	-	তিন বিশ দুই -বাষট্টি
খলথাম থাম	-	তিন বিশ তিন- তেষট্টি
খলথাম ব্রুই	-	তিন বিশ চার- চৌষট্টি
খলথাম বা	-	তিন বিশ পাঁচ-পঁয়ষট্টি
খলথাম দক	-	তিন বিশ ছয় - ছেষট্টি
খলথাম সিনি	-	তিন বিশ সাত- সাতষট্টি
খলথাম চার	-	তিনি বিশ আট- আটষট্টি
খলথাম চুকু	-	তিন বিশ নয় ঊনসত্তর
খলথাম চি	-	তিন বিশ দশ - সত্তর
খলথাম চি সা	-	তিন বিশ দশ এক - একাত্তর
খলথাম চি নাই	-	তিনি বিশ দশ দুই - বাহাত্তর
খলথাম চি থাম	-	তিন বিশ দশ তিন- তিয়াত্তর
খলথাম চি ব্রুই	-	তিন বিশ দশ চার- চুয়াত্তর
খলথাম চি বা	-	তিন বিশ দশ পাঁচ- পঁচাত্তর
খলথাম চি দক	-	তিন বিশ দশ ছয় - ছিয়াত্তর
খলথাম চি সিনি	-	তিন বিশ দশ সাত- সাতাত্তর
খলথাম চি চার	-	তিন বিশ দশ আট - আটাত্তর
খলথাম চি চুকু	-	তিন বিশ দশ নয় - ঊনআশি

খল ব্রুই	-	চার বিশ - আশি
খল ব্রুই সা	-	চার বিশ এক - একাশি
খল ব্রুই নাই	-	চার বিশ দুই - বিরাশি
খল ব্রুই থাম	-	চার বিশ তিন- তিরাশি
খল ব্রুই ব্রুই	-	চার বিশ চার - চুরাশি
খল ব্রুই বা	-	চার বিশ পাঁচ- পঁচাশি
খল ব্রুই দক	-	চার বিশ ছয়-ছিয়াশি
খল ব্রুই সিনি	-	চার বিশ সাত- সাতাশি
খল ব্রুই চার	-	চার বিশ আট- অষ্টাশি
খল ব্রুই চুকু	-	চার বিশ নয় - ঊননব্বই
খল ব্রুই চি	-	চার বিশ দশ - নব্বই
খল ব্রুই চি সা	-	চার বিশ দশ এক - একানব্বই
খল ব্রুই চি নাই	-	চার বিশ দশ দুই- বিরানব্বই
খল ব্রুই চি থাম	-	চার বিশ দশ তিন- তিরানব্বই
খল ব্রুই চি ব্রুই	-	চার বিশ দশ চার- চুরানব্বই
খল ব্রুই চি বা	-	চার বিশ দশ পাঁচ- পঁচানব্বই
খল ব্রুই চি দক	-	চার বিশ দশ ছয় - ছিয়ানব্বই
খল ব্রুই চি সিনি	-	চার বিশ দশ সাত- সাতানব্বই
খল ব্রুই চি চার	-	চার বিশ দশ আট -আটানব্বই
খল ব্রুই চি চুকু	-	চার বিশ দশ নয়- নিরানব্বই
রাসা	-	একশ
সাইসা	-	এক হাজার

ককবরকে হাজার এর বড় কোনও সংখ্যা শব্দ নেই। কোনও বড় সংখ্যা বলতে বড় থেকে ছোট অর্থাৎ হাজার, শ, বিশের গুণিতক দশ এবং একক সংখ্যাগুলি পর পর বলতে হয়। যেমন- সাইথাম রাব্রুই খলনাই চি সিনি-হাজার তিন শ'-চার বিশ দুই, দশ সাত- তিন হাজার চারশ সাইত্রিশ। এই গণনা পদ্ধতি একেবারেই সরল কোন ব্যতিক্রম নেই।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে ককবরকে এই রকম সরল একটি গণনা পদ্ধতি থাকলেও ককবরক ভাষীরা সাধারণতঃ সাত আটের চেয়ে বড় কোনও সংখ্যা ককবরকে বলেন না, বাংলায়ই বলেন। গোণার সময় তারা সা, নাই, থাম ইত্যাদি না বলে কাইসা, কাইনাই কাইথাম ইত্যাদি বলেন। (উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.৪.২(৪) দ্রষ্টব্য)

আধা বা অর্দ্ধ শব্দটির ককবরক প্রতিশব্দ 'খাকসা' (আধা এক)। আর কোনও ভগ্ন সংখ্যায় বাচক শব্দ ককবরকে বা চলিত বাংলায় নেই। বাংলায় চতুর্থাংশ ইত্যাদি সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করা হয় অথবা তিন ভাগের এক ভাগ বা তিনের এক ইত্যাদি বলা হয়। ককবরকেও তাই। বাংলায় পয়লা, দোসরা ইত্যাদি তারিখ সূচক শব্দ আছে। ককবরকে নেই। বাংলায় প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি ক্রমবাচক সংখ্যা শব্দ আছে। ককবরকে নেই।

৪.৮.০ সর্বনাম

বিশেষ্যের বিরক্তিকর পুনরাবৃত্তি পরিহারের জন্য সর্বনাম ব্যবহার করা হয়। পৃথিবীর সব ভাষাতেই সর্বনাম আছে। সব ভাষাতেই সর্বনামের সংখ্যা সীমিত। কিন্তু এই সীমিত সংখ্যক সর্বনামের মধ্যেই ভাষাতাত্ত্বিকেরা দেখতে পান ভাষার বক্তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অনেক তথ্য।

সর্বনাম প্রতিকল্প শব্দ। বিশেষ্যের মতই সর্বনাম বাক্যে সাধারণতঃ কর্তা বা কর্ম হয়। সর্বনাম বচন ও বিভক্তি চিহ্ন ধারণ করে। কিন্তু বাংলা বা ককবরকে সর্বনামের লিঙ্গ বিভাগ নেই। ত্রিপুরার গ্রামে কথ্য বাংলায় ইংরেজী he এবং she এর অনুরূপ 'তে / হিতে' এবং 'তাই' শব্দগুলি বাংলায় শোনা যায়। কিন্তু মান্য (standard) বাংলায় এগুলি নেই। ককবরকেও এগুলির সমতুল কিছু নেই।

৪.৮.১ বাংলা ও ককবরক সর্বনাম।

বাংলা	ককবরক
আমি - আমরা	আঙ- চৌঙ
তুমি- তোমরা তুই - তোরা আপনি আপনারা	নৌঙ - নরগ
সে - তারা তিনি - তাঁরা	ব-বরগ
কে- কারা	সাব'-সাব' রগ
যে -যারা	
যিনি - যাঁরা	
এটি - এগুলি	অ, অক', অব', অম', ই, ইক', ইব', ইম'-রগ
এটি -ঐগুলি	আ, আক'আব', আম', উ, উক', উব', উম'-রগ
কোনটি- কোনগুলি	বৌব'- বৌব'রগ

৪.৮.২ ককবরক সর্বনামের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করা যায়। মধ্যম পুরুষ সর্বনাম আছে একটি - নৌঙ। পক্ষান্তরে বাংলায় আছে তিনটি -আপনি, তুমি, তুই। সাধারণভাবে বলা যায় যে বাংলার 'তুমি' শব্দটি সমমর্যাদার ব্যক্তির ক্ষেত্রে, 'আপনি' সম্মানযুক্ত ভাবে, এবং 'তুই' তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আপনি, তুমি, তুই এর ব্যবহার পদ্ধতি এত সরল নয়। কেবল সম্মান নয়, আবেগ, ভালবাসা, ইত্যাদি অনেক কিছু জড়িয়ে আছে এদের সঙ্গে। এই বিষয়টি গভীর, ও বিস্তৃত আলোচনার যোগ্য। সরোজ বন্দোপাধ্যায় (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৯০ ঃ ৩০-৩৪) এই বিষয়ে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন।

ককবরকভাষী সমাজে সকলেই প্রায় অরণ্যবাসী ছিল। সুতরাং এই ভাষায় সম্মানদ্যোতক বা তুচ্ছার্থক সর্বনামের প্রয়োজন ছিল না। একটি শব্দ - নৌঙ-দিয়েই কাজ চলতো। ইদানীং এই সমাজ তথাকথিত সভ্যতার সংস্পর্শে আসছে। সুতরাং আপনি বলার প্রয়োজন অনুভুত হচ্ছে। এখন শুনতে পাই-

আপনেসঙ অর' আচুগদি

(আপনারা এখানে বসুন)

বাংলার প্রথম পুরুষ সর্বনামও দুটি আছে — 'সে' এবং তিনি। ককবরকে একটি - ব।

ককবরকে 'যে, যা' ইত্যাদি সর্বনামগুলির কোনও প্রতিশব্দ নেই। এগুলি না থাকলে জটিল বাক্য গঠন সম্ভব হয় না। এজন্য ককবরকে জটিল বাক্য গঠন হতো না। এখন জটিল বাক্যও বেশ শোনা যায়। বাংলার যে, যা ককবরকেও ব্যবহৃত হচ্ছে। এই বিষয়টি বাক্যরীতি অংশে (৪.১২.২.২) আলোচিত হয়েছে।

৪.৮.৩ বাংলা ও ককবরক উভয় ভাষাতেই সর্বনাম বহুবচন চিহ্ন ধারণ করে।

বাংলায় সর্বনামের বহুবচন চিহ্ন 'রা'। তবে 'রা' যুক্ত হলে সর্বনামটির কিছু রূপগত পরিবর্তন হয়।

যেমন- আমি, আমরা, তুমি-তোমরা, আপনি-আপনারা, তুই-তোরা, সে- তারা।

দেখা যায় 'আমি, তুমি, তুই ও আপনি' এই শব্দগুলির সঙ্গে বহুবচনদ্যোতক - রা যুক্ত হওয়ায় প্রতিটি শব্দের শেষ ই ধ্বনিটি পরিত্যক্ত হয়। 'তুই' এর বেলায় শেষ। ই। ধ্বনিটিও পরিত্যক্ত হয় আবার প্রথম ব্যঞ্জন ধ্বনিটির সঙ্গের। উ। ধ্বনিটি পরিবর্তত হয়ে। ও। হয়ে যায়। একবচনের 'সে' এবং বহুবচনের 'তারা' একেবারেই আলাদা শব্দ। এই বিষয়ে 'তারা' শব্দটির যে মান্যোতর (sub-standard) একবচন প্রতিরূপ পুংলিঙ্গ তে এবং স্ত্রীলিঙ্গ তাই গ্রাম-ত্রিপুরার কথ্য বাংলায় শোনা যায় তা অনেক বেশী যুক্তি গ্রাহ্য। তে / তাই - তারা।

তে গেছিল - সে গিয়েছিল

তারা গেছিল - তারা গিয়েছিল।

৪.৮.৪ ককবরকে সর্বনামের বহুবচন চিহ্ন-রগ। বাংলার মত ককবরকেও বহুবচনে সর্বনামটির রূপগত পরিবর্তন হয় দু' একটি জায়গায়।

আঙ - আমি চৌঙ - আমরা

নৌঙ - তুমি, তুই, আপনি নরগ - তোমরা, তোরা, আপনারা

ব - সে, তিনি বরগ - তারা, তাঁরা

৪.৮.৫ সর্বনাম বিশেষ্যের মত বিভক্তি চিহ্নও ধারণ করে। নীচে বাংলা 'আমি' শব্দের রূপটি দেওয়া গেল।

কারক	এক বচন	বহুবচন
কর্তৃ	আমি	আমরা
কর্ম	আমাকে	আমাদিগকে/ আমাদেরকে
করণ	আমাদ্বারা/দিয়া/ কর্তৃক	আমাদিগদ্বারা/ দিয়া/ কর্তৃক
সম্প্রদান	আমাকে	আমাদিগকে/ আমাদেরকে
অপাদান	আমাহতে/ আমাথেকে আমার থেকে	আমাদিগহতে/ থেকে আমাদের থেকে
অধিকরণ	আমাতে	আমাদিগে/ দিগেতে
সম্বন্ধপদ	আমার	আমাদিগের/ আমাদের

এখানে বিভক্তি যুক্ত হওয়ায় 'আমি' শব্দটির যে রূপগত পরিবতন হয়

তা লক্ষণীয়। কর্তৃকারকে একবচনে বিভক্তি চিহ্ন 'শূন্য'। সুতরাং 'আমি' অপরিবর্তিত। কর্তৃকারকে বহুবচনে 'আমি' শব্দের অন্ত্য। পরিত্যক্ত। অন্য সমস্ত কারকেও সম্বন্ধপদে দুই বচনেই 'আমি' শব্দটি 'আমা' হয়ে গেছে।

৪.৮.৬ এবার ককবরক 'আঙ' (আমি) শব্দটির রূপ নীচে দেওয়া যায়।

কারক	এক বচন	বহুবচন
কর্তৃ	আঙ-আমি	চৌঙ - আমরা
কর্ম	আন'- আমাকে	চৌঙন'- আমাদিগকে
করণ	আঙবাই-আমাদ্বারা	চৌঙবাই-আমাদেরদ্বারা
সম্প্রদান	-	-
অপাদান	আনি/আনিসিমি আমাহতে	চিনি/চিনিসিমি-আমাদের থেকে
অধিকরণ	আঙ- আমাতে	চৌঙ-আমাদিগেতে
সম্বন্ধপদ	আনি- আমার	চিনি- আমাদের

এখানে 'আঙ' শব্দটি বিভক্তিযুক্ত হওয়ায় তার যে রূপগত পরিবর্তন এসেছে তা লক্ষনীয়।

আঙ + ন = আন' আঙ + নি = আনি

আঙ + বহুবচন = চৌঙ চৌঙ + নি = চিনি

ককবরক সর্বনাম সাধারণতঃ বহুবচন বা বিভক্তি চিহ্ন যুক্ত হলেও অপরিবর্তিতই থাকে। উল্লিখিত 'আঙ' শব্দের রূপগত পরিবর্তন ছাড়া আরো যে দু' একটি ক্ষেত্রে এই রকম রূপগত পরিবর্তন আসে তা নীচে দেওয়া গেল।

নৌঙ - তুমি, নৌঙ + রগ = নরগ - তোমরা

নৌঙ + ন = নন' - তোমাকে

নীঙ + নি = নিনি- তোমার

ব-সে ব + নি = বিনি- তার

৪.৮.৭ সর্বনামজাত বিশেষণ

বাংলা সর্বনামজাত বিশেষণগুলি নীচে দেওয়া গেল।

মূল	স্থানবাচক	কালবাচক	পরিমাণবাচক	সাদৃশ্যবাচক
সে	সেথা	সেক্ষণ	তত	সেইমত
ত	সেখানে	তখন		তেমন
হে	হেথা	এইক্ষণ		
এ, এহ	এখানে, এইখানে	এখন, এক্ষণ	এত	এমত, এমন
অ, ও ওই, হো	ওখানে, ওইখানে হোথা	ওইক্ষণ	অত	অমন, ঐমত
য, যে, যেই	যেথা, যেখান যেইখান	যবে, যখন যেইক্ষণ	যত	যেমন, যেমত যেইত
ক, কে কো, কোন	কোথা, কোথায় কে, কোন্‌খানে	কখন, কবে কোনক্ষণ	কত	কেমন, কেমত কোনমত
কে, কো ও	কোথাও কোনোখানে	কখনও		কোনো

৪.৮.৮ ককবরক সর্বনামজাত বিশেষণ

ককবরক সর্বনামজাত বিশেষণগুলি নীচে দেওয়া গেল।

মূল	স্থানবাচক	কাল বাচক	পরিমাণ বাচক	সাদৃশ্যবাচক
অ	অর'-এখানে			
আ	আর'-ওখানে	আফুরু-তখন	আসুক-এইটুকু	আহাই-এমন
ব	বীর'-কোনখানে	বীফুরু-কখন	বীসুক-কত, কতটুকু	বাহাই কেমন

৪.৯.০ অব্যয় ও অব্যয় স্থানীয় শব্দ

বাক্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন পদকে বা একাধিক বাক্যকে যে পদ অন্বয় সাধন করে, অথবা যে পদ দ্বারা বক্তার মনোভাব প্রকাশ পায়, যে পদ বিভক্তি বা বচন চিহ্ন ধারণ করে না, যার লিঙ্গান্তর হয় না, যার কোনও অবস্থাতেই রূপগত পরিবর্তন হয় না সেগুলিকে অব্যয় বলে।

৪.৯.১ বাংলা অব্যয়গুলিকে (১) পদান্বয়ী (২) বাক্যান্বয়ী ও (৩) অনন্বয়ী এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। প্রথমটি একাধিক শব্দ ও দ্বিতীয়টি একাধিক বাক্যের মধ্যে অন্বয় সাধন করে। তৃতীয়টি ভাবপ্রকাশক ও সাধারণতঃ ধ্বন্যাত্মক। নীচে উদাহরণ সহ বাংলা অব্যয়গুলির আলোচনা করা গেল।

(১) পদান্বয়ী অব্যয়। উদাহরণ ঃ আর, ও, এবং, সঙ্গে ইত্যাদি।

বই আর কলম নিয়ে এসো।

রাম ও শ্যাম গিয়েছে।

রাউরকেল্লা ও চণ্ডীগড় দুটি নতুন শহর।

রহিমের সঙ্গে জন গিয়েছে।

চেয়ে, থেকে, হতে, দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক, ইত্যাদি বিভক্তি চিহ্নকেও কেউ কেউ পদান্বয়ী অব্যয় বলেছেন।

(২) বাক্যান্বয়ী অব্যয়। উদাহরণ ঃ এবং, তবু, কিন্তু, অথবা, যদি, তবে, ইত্যাদি।

তুমি কাল যাবে এবং আমার কথা উমাকে বলবে।

তুমি কাল যাবে তবু আজ বিকালে একবার এসো।

তুমি কাল যাবে কিন্তু আমি যেতে পারবো না।

তুমি কাল যাবে অথবা শ্যামকে পাঠাবে।

তুমি কাল যাবে যদি আমি টাকা পাই।

(৩) অনন্বয়ী অব্যয়। উদাহরণ ঃ হ্যাঁ, না, আচ্ছা, হায়, মরিমরি, ইত্যাদি।

৪.৯.২ ককবরক অব্যয়গুলিকে ও হুবুহু বাংলার মতই (১) পদান্বয়ী, (২) বাক্যান্বয়ী ও (৩) অনন্বয়ী এই তিনভাগে ভাগ করতে পারি। তবে ককবরকে অব্যয়ের সংখ্যা বাংলার চেয়ে কম। নীচে উদাহরণ দেওয়া গেল।

(১) পদান্বয়ী অব্যয়। উদাহরণ ঃ তাই (আর, ও, এবং)

লগি (সঙ্গে) ইত্যাদি

বই তাই কলম নাঅই ফাইদি।

(বই আর / এবং / ও কলম নিয়ে এসো।)

রাম তাই শ্যাম থাঙ্খা।

(রাম ও / আর / এবং শ্যাম গিয়েছে।)

রাউরকেল্লা তাই চন্ডীগড় আউলি কাইনাই কৌতাল।

(রাউরকেল্লা আর / ও / এবং চন্ডীগড় শহর দু'টি নতুন।)

রহিমনি লগি জন থাঙ্খা।

(রহিমের সঙ্গে জন গিয়েছে।)

'লগি' শব্দটি বাংলা থেকে আগত। ত্রিপুরা বাংলার একটি উদাহরণ দেওয়া যায়।

তুমার লগে দেহা হইসিল পাটনায়।

তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল পাটনায়।

(২) বাক্যান্বয়ী অব্যয় ঃ উদাহরণ ঃ তাই (আর, এবং, ও) তে' (তবু), ফিয়া (কিন্তু), এবা (অথবা), ত (তবে) ইত্যাদি।

নৌঙ খীনা থাঙনাই তাই আনি কক উমান' সানাই।

(তুমি কাল যাবে এবং আমার কথা উমাকে বলবে।)

নৌঙ খীনা থাঙনাই তেব' তিনি সাইরিগ' উইসা ফাইদি।

(তুমি কাল যাবে তবু আজ বিকালে একবার এসো।)

নৌঙ খীনা থাঙনাই ফিয়া আঙ থাঙনানি মানগ্লাক।

(তুমি কাল যাবে কিন্তু আমি যেতে পারবো না।)

নৌঙ খীনা থাঙনাই এবা শ্যামন' রহরনাই।

(তুমি কাল যাবে অথবা শ্যামকে পাঠাবে।)

ককবরকে 'অবস্থাত্মক বা (conditional) 'যদি' অব্যয়টি নেই। এই বাক্যান্বয়ী অব্যয়টি না থাকাতে জটিল বাক্য গঠন করা যায় না। আমরা আগেই দেখেছি (৪.৮.২) যে ককবরকে 'যে, যা' ইত্যাদি সর্বনামগুলিও নেই। 'যদি' শব্দটি এখন ককবরকেও ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ

নৌঙ খীনা থাঙনাই যদি আঙ রাঙ মান'।

(তুমি কাল যাবে যদি আমি টাকা পাই।)

(৩) অনন্বয়ী বা ভাব প্রকাশ অব্যয়।

উদাহারণ ঃ আঅ - হ্যাঁ, ইহিঁ-না, দ-আচ্ছা, আই-হায়, বাহা-বাহ্, মরিমরি, চি-ছি, ইত্যাদি।

৪.১০ ক্রিয়া

অস্তিত্ব, অবস্থা ও কার্যবাচক প্রকৃতির নাম 'ধাতু'। কাল ও পুরুষ ইত্যাদির চিহ্ন যুক্ত হয়ে বাক্যে ব্যবহৃত হলে এগুলিকে ক্রিয়াপদ বলা হয়। ক্রিয়াপদ বাক্যের প্রাণ স্বরূপ। একে আশ্রয় করেই অন্যান্য পদ মিলিত হয় এবং বাক্য গঠিত হয়। বাংলা ও ককবরক উভয় ভাষাতেই ক্রিয়াপদ সাধারণতঃ কর্তা ও কর্মের পরে বাক্যের অন্তে বসে। উভয় ভাষাতেই ক্রিয়াপদ কাল-চিহ্ন ধারণ

করে। দু'টি ভাষার কোনোটিতেই ক্রিয়াপদ বচন বা লিঙ্গের প্রভাবে পরিবর্তিত হয় না। বাংলায় ক্রিয়াপদ পুরুষ অনুযায়ী রূপ বদল করে। যাই, যা, যান, যাও, যায়, বললে কে যায় বোঝা যায়। ককবরকে ক্রিয়াপদ পুরুষ অনুযায়ী রূপ বদল করে না। 'থাঙগ' বললে যাই, যা, যান,যাও যায় সবই বোঝায়।

খেল্-থুঙ, যা-থাঙ, দেখ্-নাই, দে-রী, খা-চা, দেখা-ফুনুগ্, এগুলি ধাতু। আর খেলি-থুঙগ, যাও-থাঙদি, দেখা-নাইঅ, দিয়েছে-রীখা, খাবে-চানাই, দেখায়-ফুনুগ, এগুলি ক্রিয়াপদ।

৪.১০.১ উৎপত্তি ও প্রকৃতি বিচারে ধাতুগুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয় ঃ (১) সিদ্ধ ধাতু (Primary Roots) (২) সাধিত ধাতু (Derivative Roots) এবং (৩) সংযোগমূলক ধাতু (Compounded Roots) প্রত্যেকটির সঙ্গে কাল চিহ্ন ইত্যাদি যুক্ত হয়ে ক্রিয়াপদ তৈরী হয়।

(১) যে সব ধাতুকে আর বিশ্লেষণ করা যায় না সেগুলিকে সিদ্ধ ধাতু বলে। নীচে বাংলা ও ককবরকের কয়েকটি সিদ্ধ ধাতু এবং তা থেকে তৈরী ক্রিয়াপদের উদাহরণ দেওয়া গেল।

সিদ্ধ ধাতু		তদজাত ক্রিয়াপদ	
বাংলা	ককবরক	বাংলা	ককবরক
কর	খ্লাই	করি	খ্লাইঅ
কাঁদ	কাব	কাঁদবে	কাবনাই
খা	চা	খেয়েছে	চাখা
খেল	থুঙ	খেলে	থুঙগ
চা	সান	চেয়েছে	সানখা
দেখ	নাই	দেখেন	নাইঅ
ধর	রম	ধরেছিল	রমখা

পা	মান	পেয়েছি	মানখা
হাস	মৌনয়	হাসছে	মৌনয়অই তঙ্গ

(২) যে সব ধাতুকে বিশ্লেষণ করলে অন্য একটি ধাতু বা কোনও শব্দ এবং এক বা একাধিক প্রত্যয় পাওয়া যায় সেগুলিকে সাধিত ধাতু বলে। অর্থ ও গঠন বিচারে সাধিত ধাতুগুলিকে চারভাগে ভাগ করা যায়। নীচে এগুলির উদাহরণ দেওয়া গেল।

(ক) নিজন্ত বা প্রযোজক ধাতু।

মূল সিদ্ধ ধাতু		সাধিত ধাতু		তদজাত ক্রিয়াপদ	
বাংলা	ককবরক	বাংলা	ককবরক	বাংলা	ককবরক
থাম্	থক	থামা	বথক	থামাবে	বথকনাই
দেখ	নুগ	দেখা	ফুনুগ	দেখায়	ফুনুগ'
বাঁচ	থাঙ	বাঁচা	মাথাঙ	বাঁচিয়েছে	মাথাঙখা
ভিজ	সি	ভিজা	মিসি	ভিজায়	মিসিকা
		ভেজা		ভেজায়	

বাংলা ও ককবরক উভয় ভাষাতেই নিজন্ত প্রকরণের ব্যবস্থা আছে।

(খ) কর্মবাচ্য ও ভাববাচ্যের ধাতু।

মূল সিদ্ধ ধাতু		সাধিত ধাতু		তদজাত ক্রিয়াপদ	
বাংলা	ককবরক	বাংলা	ককবরক	বাংলা	ককবরক
দেখ	নুগ	দেখা	নুগজাক	দেখায়	নুগজাগ'
বাঁধ	ফুক	বেঁধা	ফুগজাক	বেঁধায়	ফুগজাগ'
শুন	খীনা	শোনা	খীনাজাক	শোনায়	খীনাজাগ'

চলিত বাংলায় কর্মবাচ্যের ব্যবহার খুবই কম। তুলনায় ককবরকে এর ব্যবহার অনেক বেশী। ককবরকে-জাক প্রত্যয়ান্ত সাধিত ধাতুর তালিকা হবে দীর্ঘ। এই-জাক প্রত্যয়টি সংস্কৃত নিষ্ঠা (ক্ত ও ক্তবতু) এবং ইংরেজী past participle এর অনুরূপ। জাক প্রত্যয়যুক্ত হলে সিদ্ধ ধাতুটি একদিকে যেমন সাধিত ধাতু হয়, তেমনি অন্যদিকে বিশেষণও হয়।

যেমন-

মূলসিদ্ধ ধাতু		সাধিত ধাতু		বিশেষণ
বাংলা	ককবরক	বাংলা	ককবরক	বাংলা অর্থ
দেখ্	নুগ	দেখা হওয়া	নুগজাক	দৃষ্ট
শুন	খীনা	শোনাহ	খীনাজাক	শ্রুত
লেখ	সাই	লেখাহ	সাইজাক	লিখিত
গা	রীচাব	গাওয়াহ	রীচাবজাক	গীত

(গা) নাম ধাতু।

বিশেষ্য বা বিশেষণ পদ প্রত্যয়যুক্ত হয়ে ক্রিয়ায় পরিণত হলে তাকে নাম ধাতু বলে। বাংলা নাম ধাতুর উদাহরণ ঃ রঙ-রঙা, হাত-হাতা, ধমক-ধমকা, বাহির-বাহিরা, আগু-আগুয়া ইত্যাদি।

ককবরকে ঠিক এমনটি দেখতে পাই না। তবে ককবরকে যে ক-শ্রেণির বিশেষণ আছে (দ্রঃ ৪.৬.১.১) সেগুলিকে নাম ধাতুতে ফেলতে পারি। ঐ শ্রেণীর বিশেষণগুলির আদিতে একটি ক-ধ্বনি আছে। ঐ ক-ধ্বনিটি বাদ দিলে প্রত্যেকটি একটি ধাতু হয়ে পড়ে।

বিশেষণ		ক্রিয়া	
ককবরক	বাংলা	ককবরক	বাংলা
কতর	বড়	তর	বড় হওয়া
কলক	লম্বা	লক	লম্বা হ
কসম	কালো	সম	কালো হ

কাহাম	ভালো	হাম	ভালো হ
কিসি	ভিজা	সি	ভিজে যা
ফুফুর	সাদা	ফুর	সাদা হ
কীচাঙ	ঠান্ডা	চাঙ	ঠান্ডা হ

(ঘ) ধ্বন্যাত্মক ধাতু ।

ধাতুরূপে ব্যবহৃত অনুকার ধ্বনিকে ধ্বন্যাত্মক ধাতু বলা হয়। নীচে বাংলা ধ্বন্যাত্মক ধাতুর উদাহরণ দেওয়া গেল।

কনকনা, গড়গড়া, গোঙা, চিল্লা, চেঁচা, ফুক, মিনমিনা, হাঁচ, হাপ।

ককবরকে ধ্বন্যাত্মক ধাতু আছে তবে সেগুলি সাধিত ধাতুর শ্রেণীতে পড়ে না। সেগুলি সংযোগ মূলক ধাতুর শ্রেণীতে পড়ে।

(ঙ) সংযোগমূলক ধাতু।

বাংলা ও ককবরক উভয় ভাষাতেই সংযোগমূলক ধাতুর দুটি অঙ্গ থাকে। প্রথম অঙ্গটি কোনও বিশেষ্য, বিশেষণ বা কোনও ধ্বন্যাত্মক শব্দ আর দ্বিতীয় অঙ্গটি একটি সিদ্ধ ধাতু, বা নিজস্ত ধাতু। নীচে কয়েকটি বাংলা সংযোগ মূলক ধাতুর উদাহরণ দেওয়া গেল।

কর-আহার কর, দেখা কর, ব্যবসা কর, মিষ্টি কর, বন্ধ কর, ঘ্যান ঘ্যান কর, ইত্যাদি।

খা-কিল খা, ঘুষ খা, মাথা খা, ইত্যাদি

দে-ডুব দে, তা দে, শিষ দে, ইত্যাদি।

পা-ঘুম পা, তেষ্টা পা, বাগে পা, ইত্যাদি।

হ-ঘর্মাক্ত হ, বড় হ, রাজী হ, ইত্যাদি।

ককবরকে সংযোগমূলক ধাতুর সংখ্যা কম। নীচে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল। এদের মধ্যে অনেকগুলিকেই নিজস্ত প্রকরণের অন্তর্গত করা যায়।

রী-(দে)- চারী-খাওয়া, খাইয়ে দে।

হাম রী-ভাল কর, ভাল করে দে।

জলি রী-রাগিয়ে দে, রাগা।

কমি রী-কমিয়ে দে, কমা।

খ্লাই-কর- হুনু হুনু খ্লাই-বিড় বিড় কর।

ঔঙ হ- থেপুঙ হেপুঙ ঔঙ-হাঁপ

৪.১০.২ সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়া।

যে ক্রিয়াপদ দ্বারা বাক্যের অর্থ সমাপ্ত হয় এবং বাক্যটি শেষ হতে পারে তাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে। নীচের বাক্যগুলি দেখা যায়।

আমি যাব আঙ থাঙ নাই।

তিনি বসেছেন ব আচুগখা।

সে এসেছে ব ফাইখা

আমি লিখি আঙ সাইঅ।

বাক্যগুলিতে ব্যবহৃত 'যাব থাঙনাই, বসেছেন—আচুগখা, এসেছে—ফাইখা, লিখি—সাইঅ, ইত্যাদি ক্রিয়াপদগুলি সমাপিকা, কারণ এদের দ্বারা বাক্যগুলি সমাপ্ত হয়েছে। এরা কাল চিহ্নও ধারণ করছে।

কিন্তু কোনও কোনও ক্রিয়াপদ বাক্যের অর্থকে সমাপ্ত করে না, বাক্য শেষ করতে হলে সেখানে অন্য ক্রিয়াপদের প্রয়োজন হয়। ঐ সমস্ত ক্রিয়াপদকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। আসলে কালচিহ্ন যুক্ত ক্রিয়াপদ সমাপিকা, কালচিহ্ন না থাকলে ক্রিয়া পদ অসমাপিকা।

নীচের উদাহরণগুলিতে অসমাপিকা ক্রিয়ার বিষয়টি বিশদ হবে।

(১) আমি গিয়া (গিয়ে) অনিলকে বলিব (বলব)।

আঙ থাঙগই অনিলন' সানাই।

(২) সে একটা বই কিনিয়া আনিবে। (কিনে আনবে)।

ব বই কাইসা পাইঅই তুনাই।

১নং এবং ২ নং বাক্যে 'গিয়া' ও 'কিনিয়া' ক্রিয়াপদ দুটি 'ইয়া' —প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়া। অনুরূপভাবে ককবরক বাক্য দুটিতে 'থাঙগই' (থাঙ +অই) ও 'পাইঅই' ক্রিয়াপদ দুটি 'অই'-প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়া। বাংলা-ইয়া প্রত্যয়ান্ত ও ককবরক-অই-প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার অনুরূপ এক রকম। ইয়া প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াপদগুলির দ্বিত্বও দেখা যায় বাংলায়। এগুলি অবশ্য অসমাপিকা নয়। এগুলি ক্রিয়া বিশেষণ।

(৩) ভাবিয়া ভাবিয়া লেখ। (ভেবে ভেবে লেখ।)

অআনাঅই সাহদি।

(৪) দেখিয়া দেখিয়া শিখিয়াছি। (দেখে দেখে শিখেছি।)

নাইঅই সারাঙখা।

(৫) দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেলা দেখছিলাম।

থাচাঅই খুঙমুঙ নাইঅই তঙমানি।

কিন্তু ককবরকে ক্রিয়াপদের দ্বিত্ব দেখা যায় না। ৩ নং থেকে ৫ নং বাংলা বাক্যে ক্রিয়াপদের দ্বিত্ব হয়েছে। ককবরকে হয়নি।

(৬) সে আসিলে (আসলে, এলে) আমি যাইব (যাব)।

ব ফাইখে আঙ খাঙনাই।

(৭) তুমি বলিলে (বললে) আমি আসিব (আসব)।

নাঙ সাখে আঙ ফাইনাই।

৬নং ও ৭নং বাক্যে বাংলা-ইলে প্রত্যয়ান্ত 'আসিলে' ও 'বলিলে' অসমাপিকা ক্রিয়া। অনুরূপ ভাবে ককবরক-এ প্রত্যয়ান্ত 'ফাইখে' ও 'সাখে' অসমাপিকা ক্রিয়া। বাংলা-ইলে এবং ককবরক-খে প্রত্যয়ের ব্যবহার এক রকম।

(৮) আমি খাইতে (খেতে) যাইব (যাব)।

আঙ চানানি থাঙনাই।

(৯) তুমি এখন লিখিতে (লিখতে) বসিবে (বসবে)।

নীঙ তাবুক সীইনানি আচুগনাই।

৮নং এবং ৯নং বাক্যে 'খাইতে (খেতে)' এবং 'লিখিতে (লিখতে)'-ইতে প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়া। অনুরূপ ভাবে 'চানানি' এবং 'সীইনানি' অসমাপিকা ক্রিয়া।

এখানে উল্লেখ করতে হয় যে চানানি = চা+না+নি, সীইনানি = সীই + না + নি। ক্রিয়ার সঙ্গে না যুক্ত হলে ক্রিয়া পদটি বিশেষ্য হয়ে যায়। এটি ইংরেজী ing এর অনুরূপ। চা (eat) + না (ing) = চানা। না-কে বাংলার ওয়া প্রত্যয়টির অনুরূপ বলতে পারি।

ত্রিপুরার প্রচলিত বাংলায় 'অন্' যুক্ত হয়েও ক্রিয়াপদ বিশেষ্য পরিণত হয়। খা + অন = খাওন; যা + অন = যাওন; ইত্যাদি। সুতরাং ককবরকের 'না' প্রত্যয়টিকে বাংলার 'ওয়া' অথবা 'অন' প্রত্যয়ের অনুরূপ বলতে পারি। অর্থাৎ চা + না = খা + ওয়া = খা + অন। ককবরকের নি প্রত্যয়টি আসলে সম্বন্ধ পদের চিহ্ন। বস্তুতঃ মূল বাক্যটি ছিল-

(১০) আঙ চানানি বাগৌই থাঙনাই-ককবরক।

আমি খাওয়ার জন্য যাব-মান্য বাংলা।

আমি খাওনের লাগ্যা যাইতাসি-ত্রিপুরা বাংলা।

কিন্তু প্রায়শঃই ককবরক বক্তা 'বাগৌই (জন্য) = লাগিয়া = লাগ্যা) শব্দটি বাদ দেন। বাক্যটি হয়ে যায়-আঙ চানানি থাঙনাই। এর অর্থ করা হয়-আমি খেতে যাচ্ছি। ফলে মনে করা হয় যে 'নানি' একটি প্রত্যয় এবং 'ইতে' তার

বাংলা প্রতিশব্দ।

বাংলা ইতে প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াপদগুলিরও দ্বিত্ব হয়। তবে এগুলিও ক্রিয়া বিশেষণ, ক্রিয়া নয়।

(১১) সে হাসিতে হাসিতে বলিল।

সে হাসতে হাসতে বলল।

ব মীনয় তীতাই সাখা।

এখানে ককবরকে ক্রিয়াপদের দ্বিত্ব হয় না। ক্রিয়া পদটির পরে 'তীতাই' শব্দটি বসে। এই শব্দটি আপাত অর্থহীন। এটি কেবল এখানেই বসে।

৪.১০.৩ ক্রিয়ার কাল।

প্রত্যয় ও বিভক্তি যোগে রূপান্তর ঘটলে ক্রিয়ার ব্যাপারটি ঘটে গেছে। ঘটছে বা ঘটবে বলে যে সময়ের বোধ হয় তাকে ক্রিয়ার কাল বলে।

বাংলা ও ককবরক উভয় ভাষাতেই ক্রিয়ার তিনটি মৌলিক কাল আছে (১) অতীত, (২) বর্তমান ও (৩) ভবিষ্যৎ। এই কালগুলির বাক্যের উদাহরণ নীচে দেওয়া গেল।

অতীত ঃ আমি দেখলাম।

আঙ নাইখা।

বর্তমান ঃ আমি দেখি।

আঙ নাইঅ।

ভবিষ্যৎ ঃ আমি দেখব

আঙ নাইনাই।

৪.১০.৩.১ বাংলা ব্যাকরণে এই কালগুলিকে কয়েকটি প্রকার (aspect) এ ভাগ করা হয়।

অতীত ঃ (১) সাধারণ অতীত ঃ আমি দেখলাম।

(২) ঘটমান অতীত ঃ আমি দেখছিলাম।

(৩) পুরাঘটিত অতীত ঃ আমি দেখেছিলাম।

(৪) নিত্যবৃত্ত অতীত ঃ আমি দেখতাম।

বর্তমান ঃ

(১) সাধারণ বা নিত্য বর্তমান ঃ আমি দেখি।

(২) ঘটমান বর্তমান ঃ আমি দেখছি।

(৩) পুরাঘটিত বর্তমান ঃ আমি দেখেছি।

ভবিষ্যৎ ঃ

(১) সাধারণ ভবিষ্যৎ ঃ আমি দেখব।

(২) ঘটমান ভবিষ্যৎ ঃ আমি দেখতে থাকব।

(৩) পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ ঃ বাবা আসার আগেই আমি (ছবিটা) দেখে ফেলব।

৪.১০.৩.২ ককবরকের ক্রিয়ার কাল এর প্রকারগুলি নীচে দেওয়া গেল।

অতীত ঃ (১) সাধারণ বা নিকট অতীত ঃ আঙ নাইখা।
আমি দেখেছি / দেখলাম।

(২) নিত্য এবং দূর অতীত ঃ আঙ নাইমানি।
আমি দেখতাম / দেখেছিলাম।

(৩) ঘটমান অতীত ঃ আঙ নাইঅই তঙখা / তঙমানি।
আমি দেখছিলমা।

বর্তমান ঃ সাধারণ বা নিত্য বর্তমান ঃ আঙ নাইঅ।
আমি দেখি।

ঘটমান বর্তমান ঃ আঙ নাইঅই তঙগ।
আমি দেখছি।

ভবিষ্যৎ ঃ সাধারণ ভবিষ্যৎ ঃ আঙ নাইনাই।
আমি দেখব।

সামান্য ভবিষ্যৎ ঃ আঙ নাইআনু।
আমি দেখব (দেখতে পারি)।

ঘটমান ভবিষ্যৎ ঃ আঙ নাইঅই তঙনাই।
আমি দেখতে থাকব।

৪. ১০. ৩.৩ বাংলাও ককবরক ক্রিয়ার কাল এর প্রকার গুলির তুলনামূলক আলোচনা।

অতীত কাল ঃ

(ক) বাংলা সাধারণ অতীত, পুরাঘটিত অতীত ও পুরাঘটিত বর্তমান কাল উত্তম পুরুষে ক্রিয়ার রূপ হয় দেখ্ +লাম, দেখ্ + এছিলাম, ও দেখ্ + এছি।

(ইংরেজীতেও এই তিনটি প্রকার আছে। তবে পুরাঘটিত অতীতের ব্যবহার ইংরেজীতে হয় একটি বিশেষ ক্ষেত্রে— একই বাক্যে অতীতে ঘটিত দুটি ক্রিয়ার কথা থাকলে এবং একটি আগে ও একটি পরে ঘটেছে বলে স্পষ্ট উল্লেখ থাকলে যেটি আগে ঘটেছে সেটি পুরাঘটিত অতীত হয়। বাংলায় এরকম কিছু নেই।

যেমন ঃ ডাক্তার ঃ নির্দেশ মত সব করেছিলে?

রোগী ঃ হ্যাঁ করেছিলাম।

ডাক্তার ঃ ঠান্ডা জলে পা ডুবিয়ে রেখেছিলে?

রোগী ঃ হ্যাঁ। কিন্তু ব্যথা কমে নি। বেড়েছে।

ডাক্তার ঃ আচ্ছা মলমটা বদলে দিচ্ছি।

ইংরেজীতে পুরাঘটিত বর্তমান সম্পর্কেও সুনির্দিষ্ট নিয়ম দেওয়া আছে। বাক্যে ক্রিয়াটি কখন ঘটেছে তার স্পষ্ট উল্লেখ থাকলে সেটি পুরাঘটিত বর্তমানে

হবে না, সাধারণ অতীতে হবে। বাংলায় এরকম কিছু বাধ্য বাধকতা নেই।

যথা— ১ম-তুমি খেয়েছ?

২য়- হ্যাঁ খেয়েছি।

১ম- বইটা তুমি পড়েছ?

২য়- হ্যাঁ পড়েছি।

১ম-এই ঘটনার কথা তুমি আগে শুনেছ?

২য়-হ্যাঁ, আমি মাস তিনেক আগে শুনেছি।

অর্থাৎ কালচিহ্ন পৃথক থাকলেও বাংলায় পুরাঘটিত অতীত, সাধারণ অতীত ও পুরাঘটিত বর্তমানের অর্থগত পার্থক্য সুস্পষ্ট নয়। আমাদের মতে এই তিনটিই অতীত। পুরাঘটিত বর্তমানকে নিকট অতীত ও পুরাঘটিত অতীতকে দূর অতীত বলা যায়। সাধারণ অতীতকে এই নামেই রাখা যায়।

(খ) ককবরকে পুরাঘটিত বর্তমান বা পুরাঘটিত অতীত বলে কোন কাল প্রকার নেই। বাংলার পুরাঘটিত বর্তমান ককবরকের সাধারণ অতীত এবং বাংলার পুরাঘটিত অতীত ককবরকের দূর অতীত এর সমার্থক।

(গ) বাংলার নিত্যবৃত্ত অতীত এর হুবহু ব্যবহার ককবরকে দেখতে পাই না। তবে দূর অতীত এর ব্যবহার দিয়ে কাজ চালানো হয়।

(ঘ) সাধারণ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ দুই ভাষাতেই এক রকম।

(ঙ) ঘটমান অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ দুই ভাষাতেই এক রকম।

(চ) ককবরকে পুরাঘটিত অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যৎ কোনোটাই নেই।

(ছ) ককবরকে সাধারণ ভবিষ্যৎ ও সামান্য ভবিষ্যৎ বলে দু'টি প্রকার দেখানো হয়েছে। সামান্য ভবিষ্যৎটি দিয়ে কেবল সম্ভাবনা বোঝায়। যেমন আঙ থাঙগানু (থাঙ + আনু) = আমি যেতে পারি। এই কাল প্রকারটির চিহ্ন 'আনু'। কিন্তু ক্রিয়াটি যদি আ-কারন্ত হয় তাহলে 'আনু' টি 'উানু' হয়।

যেমন- নীঙ বিনি কক খীনাউানু।

তুমি ওর কথা শুনবে।

৪.১০.৩.৪ ক্রিয়ার কালচিহ্ন।

বাংলা ক্রিয়াপদে কালচিহ্নের সঙ্গে পুরুষের চিহ্নও যুক্ত থাকে। সেই জন্য খেয়েছি, যাস্, লেখ, নিন্, পড়ে, ইত্যাদি বললেই বোঝা যায় যে ক্রিয়াগুলির কর্তা যথাক্রমে আমি/আমরা, তুই/তোরা, তুমি/ তোমরা, আপনি/ আপনারা, সে/ তারা, ইত্যাদি। কিন্তু ককবরকে ক্রিয়াপদে পুরুষের কোনও চিহ্ন থাকে না। সুতরাং ক্রিয়ার সঙ্গে কর্তার উল্লেখ অপরিহার্য। এ বিষয়ে ককবরক ইংরেজীর কাছাকাছি। তবে ইংরেজীতেও সাধারণ বর্তমান কালে, একবচনে প্রথম পুরুষের কর্তা থাকলে ক্রিয়া পুরুষের চিহ্ন ধারণ করে। ককবরকে তাও নেই। সুতরাং বাংলায় ক্রিয়ার কালচিহ্ন একটি জটিল ব্যাপার। ককবরকে বিষয়টা তুলনামূলকভাবে অনেক সরল। একটি ধাতুরূপ থেকেই বাংলা ও ককবরক কালচিহ্নগুলির স্বরূপ জানা যাবে।

৪.১০.৩.৫ ধাতুরূপ।

নীচে বাংলা 'খা' ককবরক 'চা' (ইংরেজী-eat) ধাতুটির রূপ দেওয়া গেল।

(১) বাংলা-সাধারণ বর্তমান

ককবরক-সাধারণ বর্তমান

এক বচন		বহু বচন	
আমি খাই-	আঙ চাঅ	আমরা খাই-	চীঙ চাঅ
তুমি খাও তুই খাস- আপনি খান	নীঙ চাঅ	তোমরা খাও তোরা খাস- আপনারা খান	নরগ চাঅ
সে খায় তিনি খান	ব চাঅ	তারা খায় তাঁরা খান	বরগ চাঅ

বাংলায় ক্রিয়ার কালচিহ্ন দুই বচনেই এক প্রকার। সম্মানিতদের ক্ষেত্রে মধ্যম পুরুষ (আপনি/আপনারা) ও প্রথম পুরুষ (তিনি/তাঁরা) এ কালচিহ্ন অভিন্ন। ককবরকে সকল পুরুষে ও বচনে কালচিহ্ন এক। সাধারণ বর্তমানের চিহ্নটি 'অ'।

(২) বাংলা-ঘটমান বর্তমান

ককবরক -ঘটমান বর্তমান।

এক বচন	বহু বচন
আমি খাচ্ছি- আঙ চাআই তঙগ।	আমরা খাচ্ছি চৌঙ চাআই তঙগ।
তুমি খাচ্ছ তুই খাচ্ছিস- } নৌঙ চাআই তঙগ। আপনি খাচ্ছেন	তোমরা খাচ্ছ তোরা খাচ্ছিস - } নরগ চাআই তঙগ। আপনারা খাচ্ছেন
সে খাচ্ছে- } ব চাআই তঙগ। তিনি খাচ্ছেন-	তারা খাচ্ছে- } বরগ চাআই তঙগ। তাঁরা খাচ্ছেন

(৩) বাংলা পুরাঘটিত বর্তমান

ককবরক সাধারণ বা নিকট অতীত

এক বচন	বহু বচন
আমি খেয়েছি- আঙ চাখা।	আমরা খেলাম- চৌঙ চাখা।
তুমি খেয়েছ তুই খেয়েছিস- } নৌঙ চাখা। আপনি খেয়েছেন	তোমরা খেলে তোরা খেলি- } নরগ চাখা। আপনারা খেলেন
সে খেয়েছে } ব চাখা। তিনি খেয়েছেন	তারা খেল } বরগ চাখা। তাঁরা খেলেন

(৪) বাংলা-সাধারণ অতীত

ককবরক-সাধারণ অতীত

এক বচন	বহু বচন
আমি খেলাম আঙ চাখা।	আমরা খাচ্ছিলাম-চৌঙ চাআই তঙখা।
তুমি খেলে তুই খেলি } নৌঙ চাখা। আপনি খেলেন	তোমরা খাচ্ছিলে তোরা খাচ্ছিলি- } নরগ চাআই তঙখা। আপনারা খাচ্ছিলেন
সে খেল } ব চাখা। তিনি খেলেন	তারা খাচ্ছিল } বরগ চাআই তঙখা। তাঁরা খাচ্ছিল-

(৫) বাংলা-ঘটমান অতীত

ককবরক-ঘটমান অতীত

এক বচন	বহু বচন
আমি খাচ্ছিলাম আঙ চাআই তঙখা।	আমরা খেয়েছিলাম- চৌঙ চামানি।
তুমি খাচ্ছিলে তুই খাচ্ছিলি } নৌঙ চাআই তঙখা। আপনি খাচ্ছিলেন	তোমরা খেয়েছিলে তোরা খেয়েছিলি } নরগ চামানি। আপনারা খেয়েছিলেন
সে খাচ্ছিল } ব চাআই তাঙখা। তিনি খাচ্ছিলেন	তারা খেয়েছিল } বরগ চামানি। তাঁরা খেয়েছিলেন

(৬) বাংলা-পুরাঘটিত অতীত

ককবরক-দুর অতীত

এক বচন	বহু বচন
আমি খেয়েছিলাম - আঙ চামানি।	আমরা খাচ্ছি- চৌঙ চাখা।
তুমি খেয়েছিলে তুই খেয়েছিলি } নৌঙ চামানি। আপনি খেয়েছিলেন	তোমরা খেয়েছ তোরা খেয়েছিস } নরগ চাখা। আপনারা খেয়েছেন
সে খেয়েছিল } ব চামানি। তিনি খেয়েছিলেন	তারা খেয়েছে } বরগচাখা। তাঁরা খেয়েছেন

(৭) বাংলা নিতবৃত্ত অতীত

ককবরক-দূর অতীত

একবচন	বহু বচন
আমি খেতাম- আঙ চামানি।	আমরা খেতাম- চৌঙ চামানি।
তুমি খেতে তুই খেতি- আপনি খেতেন } নৌঙ চামানি।	তোমরা খেতে তোরা খেতি- আপনারা খেতেন } নরগ চামানি।
সে খেতো তিনি খেতেন- } ব চামানি।	তারা খেতো তাঁরা খেতেন- } বরগ চামানি।

(৮) বাংলা-সাধারণ ভবিষ্যৎ

ককবরক-সাধারণ ভবিষ্যৎ

এক বচন	বহুবচন
আমি খাব আঙচানাই।	আমরা খাব চৌঙ চানাই।
তুমি খাবে তুই খাবি আপনি খাবেন } নৌঙ চানাই।	তোমরা খাবে তোরা খাবি আপনারা খাবেন } নরগ চানাই।
সে খাবে তিনি খাবেন } বা চানাই।	তারা খাবে তাঁরা খাবেন } বরগ চানাই।

(৯) ককবরক-সামান্য ভবিষ্যৎ

বাংলা-সাধারণ ভবিষ্যৎ

একবচন	বহুবচন
আমি খাব/খেতে পারি- আঙ চাউনু।	আমরা খাব/ খেতে পারি - চৌঙ চাউনু।
তুমি খাবে/খেতে পার তুই খাবি/খেতে পারিস আপনি খাবেন/খেতে পারেন } নৌঙ চাউনু।	তোমরা খাবে/ খেতে পার তোরা খাবি/ খেতে পারিস- আপনারা খাবেন/খেতে পারেন } নরগ চাউনু।
সে খাবে/খেতে পারে তিনি খাবেন/খেতে পারেন } ব চাউনু।	তারা খাবে/খেতে পারে তাঁরা খাবে/খেতে পারেন } বরগ চাউনু।

(১০) বাংলা-ঘটমান ভবিষ্যৎ

ককবরক-ঘটমান ভবিষ্যৎ

একবচন	বহুবচন
আমি খেতে থাকব- আঙ চাঅই তঙনাই।	আমরা খেতে থাকব-চৌঙ চাঅই তঙনাই।
তুমি খেতে থাকবে তুই খেতে থাকবি- আপনি খেতে থাকবেন } নৌঙ চাঅই তঙনাই।	তোমরা খেতে থাকবে তোরা খেতে থাকবি- আপনারা খেতে থাকবেন } নরগ চাঅই তঙনাই।
সে খেতে থাকবে- তিনি খেতে থাকবেন } ব চাঅই তঙনাই।	তারা খেতে থাকবে- তাঁরা খেতে থাকবেন } বরগ চাঅই তঙনাই।

(১১) বাংলা পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ ও তার ককবরক অনুবাদ

একবচন	বহুবচন
আমি খেয়ে ফেলব-আঙ চাঅই পাইনাই।	আমরা খেয়ে ফেলব-চৌঙ চাঅই পাইনাই।
তুমি খেয়ে ফেলবে তুই খেয়ে ফেলবি আপনি খেয়ে খেলবেন } নৌঙ চাঅই পাইনাই।	তোমরা খেয়ে ফেলবে তোরা খেয়ে ফেলবি- আপনারা খেয়ে ফেলবেন } নরগ চাঅই পাইনাই।
সে খেয়ে খেলবে- তিনি খেয়ে ফেলবেন } ব চাঅই পাইনাই।	তারা খেয়ে ফেলবে- তাঁরা খেয়ে ফেলবেন } নরগ চাঅই পাইনাই।

৪,১০,৩,৬ ককবরক কাল চিহ্নগুলি সংক্ষেপে নীচে দেওয়া হল-

সাধারণ বর্তমান- অ

সাধারণ অতীত- খা

সাধারণ ভবিষ্যৎ— নাই

ঘটমান হলে ক্রিয়ার সঙ্গে 'অই তঙ' এবং শেষে কাল দ্যোতক অ/খা/নাই যুক্ত হয়।

দূর অতীত- মানি
সামান্য ভবিষ্যৎ- আনু/উানু

৪.১০. ৪ ক্রিয়ার ভাব প্রদর্শক প্রকার (Mood)

বাংলায় তিনটি ক্রিয়ার ভাব প্রদর্শক প্রকার দেখা যায়।

(১) অবধারক বা নির্দেশক প্রকার।

সে স্কুলে যায়।

ব ইস্কুল' থাঙ্গ।

এই বাক্যটি সাধারণ বর্তমান কালে।

সকল কালেই নির্দেশক প্রকারের বাক্য গঠিত হতে পারে।

(২) আজ্ঞা দ্যোতক বা নিয়োজক প্রকার বা অনুজ্ঞা। 'তুমি কাজটা কর।' নীঙ অ সামুঙ তাঙদি। এই বাক্যটি গঠনের দিক থেকে নির্দেশক বাক্যের মতই। তবে এই বাক্যটিতে কর্তা 'তুমি' বাদ দিয়েও বলা যায়। অর্থ পূর্ণ হয়। ককবরক বাক্যটিতে ক্রিয়ার সঙ্গে অনুজ্ঞাদ্যোতক 'দি' যুক্ত হয়ে বাক্যটিকে স্পষ্ট অনুজ্ঞাসূচক করেছে।

আপনি কাজটা করুন।

নীঙ অ সামুঙ তাঙদি।

বাক্যটির কর্তা 'আপনি' হলে ক্রিয়ার সঙ্গে 'উন' যুক্ত হয়, নির্দেশক বাক্যের ক্রিয়ার সঙ্গে 'এন' যুক্ত হয় (আপনি কাজটা করেন)। ককবরকে কেবল 'দি' যুক্ত হয়।

তুই কাজটা কর।

নীঙ অ সামুঙ তাঙদি।

বাক্যটির কর্তা 'তুই' ক্রিয়ার সঙ্গে কিছু যুক্ত হয় না। ককবরকে 'দি' যুক্ত হয়।

তিনি কাজটা করুন।

সে কাজটা করুক।

ব অ সামুঙ তাঙথুন।

অনুজ্ঞা সূচক বাক্যের কর্তাটি প্রথম পুরুষের হলে ক্রিয়ার সঙ্গে বাংলায় 'উক' ও ককবরকে 'থুন' যুক্ত হয়। কিন্তু কর্তা সম্মানযুক্ত 'আপনি' হলে বাংলায় ক্রিয়ার সঙ্গে 'উন' যুক্ত হয়। 'উন' সম্মানযুক্ত মধ্যম পুরুষ আপনির বেলায় হয়। বস্তুতঃ বাংলায় মধ্যম পুরুষ 'আপনি' এবং প্রথম পুরুষ 'তিনি'র বেলায় ক্রিয়ার চিহ্ন সর্বত্রই এক রকম। এটি সংস্কৃতের উত্তরাধিকার। সংস্কৃতের বৈয়াকরণেরা এই বিষয়টা লক্ষ্য করেই 'ভবান' (আপনি) কে প্রথম পুরুষ করেছেন। ককবরকে নির্দেশক প্রকারে ক্রিয়ার কাল চিহ্ন সকল পুরুষে ও বচনে এক রকম। অনুজ্ঞার বেলায় মধ্যম পুরুষ ক্রিয়ার সঙ্গে 'দি' ও প্রথম পুরুষে ক্রিয়ার সঙ্গে 'থুন' যুক্ত হয়।

(৩) ঘটনান্তরাপেক্ষিত প্রকার।

যদি যে আসে তবে আমি যাব।

যদি ব ফাইঅ ত আঙ থাঙনাই।

বিকল্প অনুবাদ ঃ

ব ফাইখে আঙ থাঙনাই।

সে আসলে আমি যাব।

ককবরকে 'যদি' 'তবে', ইত্যাদি শব্দগুলি নেই। তবে এই বাংলা শব্দগুলি ব্যবহার করেও বাক্য তৈরী হয়।

ইংরেজী ব্যাকরণে 'অসমাপিকা প্রকার' -Infinitive Mood বলে আরও একটি প্রকার দেখানো হয়। আমরা এইটি আলাদাভাবে 'সমাপিকা ও অসমাপিকা' শীর্ষক (৪.১০.২) দিয়ে আলোচনা করেছি। বাংলা ব্যাকরণে তাই করা হয়ে থাকে। অসমাপিকা বিষয়টি ক্রিয়ার ভাব-প্রদর্শক একটি প্রকার মাত্র নয়। আরও অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। সেই জন্যই তার আলোচনাও স্বতন্ত্রভাবে করা হয়।

৪.১১.০ শব্দ গঠন।

এই নিবন্ধের 'শব্দভান্ডার নামক তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় অনুচ্ছেদে আমরা লিখেছি ঃ প্রত্যেক ভাষার বক্তারই প্রয়োজন হয় তার চার পাশে যে সব প্রাণী ও বস্তু সামগ্রী আছে তাদের নামের জন্য শব্দ (বিশেষ্য) অবস্থান, গতি, বা কাজ বোঝা বা জন্য প্রয়োজনীয় শব্দ (ক্রিয়া) বড়, ছোট, ভাল, মন্দ, ইত্যাদি গুণবাচক কিছু শব্দ (বিশেষণ); কোন ব্যক্তি বা বস্তুর নাম বিরক্তিকর ভাবে বার বার ব্যবহার পরিহার করার জন্য কিছু প্রতিকল্প শব্দ (সর্বনাম); আর এই সব শব্দ দিয়ে বাক্য গড়ে তোলার জন্য দরকার হয় কিছু শব্দ ও কিছু আপাত অর্থহীন ধ্বনি (অব্যয়, প্রত্যয়, বিভক্তি, কালচিহ্ন ইত্যাদি)। কিন্তু যে কোনও ভাষাভীষারই অভিজ্ঞতা নিরন্তর বাড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে তার শব্দের প্রয়োজন। প্রতিটি ভাষারই শব্দ সংখ্যা বাড়ছে প্রতিনিয়ত। কিছু কিছু শব্দ অবশ্য অব্যবহৃত থেকে যাচ্ছে, বক্তারা ভুলে যাচ্ছে অনেক শব্দ।

শব্দের হারিয়ে যাওয়ার কারণ খোঁজা আমাদের বিষয় নয়। কিন্তু শব্দ সংখ্যা কেমন করে বাড়ে তা আমরা জানতে আগ্রহী। শব্দ বাড়ার একটা উপায় অন্য ভাষা থেকে শব্দ গ্রহণ। ইংরেজী ভাষায় হাজার হাজার বিদেশী শব্দ আছে। ককবরকেও বিদেশী শব্দ আছে, বাংলায়ও আছে। প্রয়োজন হলেই লোকে ধার করে। সুতরাং এটাও আমাদের গবেষণায় বিষয় নয়। প্রত্যেক ভাষায় নতুন শব্দ গঠিত হাওয়ার নিজস্ব পদ্ধতি আছে। নতুন শব্দ গঠন করে ভাষার বক্তারা। এই অধ্যায়ে বাংলা ও ককবরকের নতুন শব্দ গঠনের প্রধান প্রধান নিয়মগুলি আলোচনা করছি আমরা।

৪.১১.১ কিভাবে বিভিন্ন ভাষার মৌলিক শব্দগুলি এসেছে বা গঠিত হয়েছে তা বলা কঠিন। Potter (1950:78) বলেন "At all periods in the history of a language a new word may suddenly appear as if from no-where, or a new word may be deliberately created by one man who tells the world exactly what he is doing.

সতরাং অধিকাংশ ক্ষেত্রে শব্দের জন্ম রহস্য উন্মোচন করা দুঃসাধ্য কাজ। তবে এই মন্তব্য খাটে কেবল মৌলিক শব্দগুলির বেলায়। কিন্তু ঐ মৌলিক

শব্দগুলি ছাড়াও বহু শব্দ গঠিত হয়, তার নানা পদ্ধতি আছে বিভিন্ন ভাষায়। বাংলা ও ককবরকে প্রধানতঃ দুই ভাবেই শব্দ গঠিত হয় ঃ

(১) প্রত্যয় যোগে, এবং (২) সমাসবদ্ধ হয়ে।

৪.১১.১.১ প্রত্যয় (Formative Affixes) । বাংলা ব্যাকরণে প্রত্যয়কে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে, (১) কৃৎ এবং (২) তদ্ধিত। যে সব প্রত্যয় ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে শব্দ গঠন করে সেগুলিকে কৃৎপ্রত্যয় এবং যে সব প্রত্যয় ধাতু ছাড়া অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শব্দ গঠন করে সেগুলিকে তদ্ধিত প্রত্যয় বলা হয়েছে। বাংলা ব্যাকরণে কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়গুলিকে আবার বাংলা বা প্রাকৃতজ এবং সংস্কৃতজ এই দুই শ্রেণীতেও ভাগ করা হয়। ককবরকের সংস্কৃত বা তৎসমতুল কোনও উত্তরাধিকার নেই। সুতরাং এই বিভাগগুলির প্রয়োজন ককবরকের নেই।

৪.১১.১.২ বাংলা ব্যাকরণে কৃৎ প্রত্যয়ের দীর্ঘ আলোচনা আছে। নীচে প্রধান কৃৎ প্রত্যয়গুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল।

(১) ধাতুকে বিশেষ্য বা বিশেষণে পরিণত করার প্রত্যয়।

অঃ কাঁদ-কাঁদ (কাঁদো-কাঁদো), মরো-মরো, ইত্যাদি।

উঃ উড়ু-উড়ু, ডুবু-ডুবু, ইত্যাদি।

অন ঃ খা + অন>খাওন, থাকন, নাচন, কান্দন, ইত্যাদি।

-অন+আ ঃ কান্দন+আ>কান্না, গাওন + আ > গাওনা, ইত্যাদি।

-অন ঈ ঃ কান্দন + ঈ> কান্দনী > কাঁদুনী ইত্যাদি।

আ ঃ চলা, দেখা, জানা, রাখা ইত্যাদি।

আয় (নিজন্ত) ঃ দেখায়, জানায়, ইত্যাদি।

আইৎ, আৎ-আতীঃ ডাকাইত, ডাকাত, ডাকাতি, সেবাইত, পোয়াতী ইত্যাদি।

(২) অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রত্যয়।

-ইতে ঃ করিতে, করতে, দেখিতে, দেখতে, যাইতে, যেতে, ইত্যাদি।

-ইয়া ঃ করিয়া, করে, খাইয়া, খেয়ে, চাহিয়া, চেয়ে ইত্যাদি।

-ইলে ঃ চলিলে, চললে, খাইলে, খেলে, চাহিলে, চাইলে, ইত্যাদি।

(৩) কাল চিহ্ন

-ইত ঃ করিত, করত, যাইত, যেত, নাচিত, নাচত, ইত্যাদি।

-ইব ঃ করিব, করব, খাইব, খাব, যাইব, যাব, ইত্যাদি।

-ইল ঃ করিল, করল, খাইল, খেল, গাইল, ইত্যাদি।

(৪) ক্রিয়ার কারক বোঝাতে

-অক ঃ কারক, পাচক, পাঠক, গায়ক, চালক, ইত্যাদি।

৪.১১.১.৩ ককবরকেও প্রধান যে সব কৃৎ-প্রত্যয় দেখতে পাই সেগুলি নীচে দেওয়া গেল।

(১) ধাতুকে বিশেষ্য পরিণত করার প্রত্যয়।

-না ঃ চা -খা, চানা-খাওয়া, থাঙ-যা, থাঙনা-যাওয়া ইত্যাদি।

-মা ঃ কিরি-ভয় করা, কিরিমা-ভীতি।

-মুখ ঃ চা-খা, চামুঙ-খাদ্য, থুঙ-খেলা কর, থুঙমুঙ-খেলা, কাব-কাঁদ, কাবমুঙ-কান্না, ইত্যাদি।

(২) অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রত্যয়।

-নানি ঃ চা -খা, চানানি-খাইতে, থাঙ-যা, থাঙনানি+ যাইতে, ইত্যাদি।

-অই ঃ চাঅই-খাইয়া, খেয়ে, থাঙগই-গিয়া, গিয়ে, নাই-দেখ, নাইঅই-দেখিয়া দেখে, ইত্যাদি।

-খে ঃ সা-বল্, সাখে-বললে, থাঙখে- গেলে, ইত্যাদি।

(৩) কালচিহ্ন

-অ ঃ থাঙ + অ=থাঙ্গ-যায়, চা + অ-চাঅ-খায় ইত্যাদি।

খাঃ খাঙখা-গেল, চাখা-খেল ইত্যাদি।

-নাই ঃ থাঙনাই-যাবে, চানাই-খাবে, ইত্যাদি।

(৪) ক্রিয়ার কারক বোঝাতে

-নায় ঃ তাঙ-কর, তাঙনায়-কারক, রীচাব-গা, রীচাবনায়-গায়ক, পড়ি-পড়, পড়িনায়-পাঠক, ইত্যাদি।

(-নায় প্রত্যয়টি বাংলার 'অ' প্রত্যয়ের অনুরূপ। ইংরেজীতে এটি -er, এগুলি ছাড়াও ককবরকে আরও কয়েকটি কৃৎ প্রত্যয় দেখতে পাই)

(৫) -লাক / গ্লাক / লাক ঃ ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে একাধারে ভবিষ্যৎ কাল ও নঞর্থক বোঝায়। থাঙ-যা, থাঙ গ্লাক / থাঙলাক-যাবে না, চা-খা, চাগলাক খাবেনা, কাব-কাদ, কাবলাক-কাঁদিবে না, ইত্যাদি।

(৬) -জাক ঃ ইংরেজী Past participle বা সংস্কৃত নিষ্ঠা (ক্ত ও ক্তবতু) এর অনুরূপ। ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে কর্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে ব্যবহৃত হয়। -জাক প্রত্যয়ান্ত শব্দ বিশেষণও বটে। চা-খা, চাজাক-ভুক্ত, নাই -দেখ, নাইজাক-দৃষ্ট, খীনা-শুন, খীনাজাক-শ্রুত, ইত্যাদি।

(৭) তুতুই / তীতাই ঃ ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে ক্রিয়ার অসমাপিকা ঘটমান বা ক্রিয়া বিশেষণ বোঝায়। বাংলায় এই অবস্থায় ক্রিয়াটির দ্বিত্ব হয়।

কাব-কাঁদ, কাবতীতাই-কাঁদতে কাঁদতে, চা-খা, চা তীতাই-খেতে খেতে, ইত্যাদি।

(৮) -খুন-অনুজ্ঞা চিহ্ন। বাংলায় সম্মানজক স্থলে-উন এবং সম্মানহীন স্থলে-উক হয়।

আচুগ-বস্, আচুগথুন-বসুন / /বসুক, পাই-কিন, পাইথুন-কিনুন / কিনুক।

(৯) -দি-অনুজ্ঞাচিহ্ন। থাঙ-যা, থাঙদি-যা / যাও / যান, ফাই-আস্, ফাইদি-আয় / এসো / আসুন, ইত্যাদি।

৪.১১. ১.৪ তদ্ধিত প্রত্যয়।

বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়ের মধ্যে ধরা হয় লিঙ্গচিহ্ন, আদর অনাদরের চিহ্ন, ইত্যাদি। বাংলা ব্যাকরণে বাংলা, সংস্কৃত ও বিদেশী তদ্ধিত প্রত্যয়ের দীর্ঘ তালিকা আছে। ককবরকেও তদ্ধিত প্রত্যয় আছে। তবে তাদের সংখ্যা অনেক কম।

লিঙ্গ চিহ্ন ককবরকেও আছে। আদর অনাদরের চিহ্ন দেখা যায় না। বাংলায় সংস্কৃতের উত্তরাধিকার অপত্যার্থে তদ্ধিত দেখাতে পাই। যেমন-দশরথ-দাশরথি, সত্যক-সাত্যকি, দ্রুপদ-দ্রৌপদ, ইত্যাদি। ককবরকে দেখতে পাই তসলামফা-তসলামের বাবা, তখিরাইফা-তখিরায়ের বাবা, ইত্যাদি। অপত্যার্থে প্রত্যয়ের প্রয়োগটি দেখতে পাই না।

এগুলি ছাড়াও ককবরকে আরও যে ক'টি তদ্ধিত প্রত্যয় দেখতে পাই সেগুলি নীচে দেওয়া গেল।

(১) কৌরাই নাই ঃ মুঙকৌরাই-নামনাই-অখ্যাত,
রাঙকৌরাই-টাকা নাই-নির্ধন, গরীব।

(২) গীনাঙ / গ্নাঙ-বান ঃ রাঙগীনাঙ- ধনবান
বুদদিগীনঙ- বুদ্ধিমান
মুঙগীনাঙ - খ্যাতি (নাম) মান।

৪.১১.২ সমাস (Compounds)। একাধিক শব্দ একত্র হয়ে একটি বড় শব্দ গড়ে তুললে তাকে সমাস বলে। বাংলা ব্যাকরণে সমাস একটি সুদীর্ঘ পরিচ্ছেদ। সমাসকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়। তবে সমাস প্রথমতঃ তিন প্রকার—

(১) সংযোগমূলক -দ্বন্ধ

(২) ব্যাখ্যামূলক-তৎপরুষ, কর্মধারয় ও দ্বিগু

(৩) বর্ণনামূলক- বহুব্রীহি

তৎপুরুষ, কর্মধারয় ও বহুব্রীহিকে আবার বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। বাংলার প্রধান সমাস গুলির উদাহরণ ও ককবরকে তৎসদৃশ যা পাওয়া যায় তা নীচের অনুচ্ছেদগুলিতে দেওয়া গেল।

৪.১১.২.১ সংযোগমূলক সমাস (Copulative বা Collective Compounds) দ্বন্দ্ব সমাস। এই সমাসে সমস্যমান পদগুলির প্রাধান্য বজায় থাকে কেউ কারও দ্বারা সংকুচিত হয় না।

সমস্যমান পদ	সমস্ত পদ	ককবরক
মা ও বাবা	মা বাবা	মাফা
ভাই ও বোন	ভাই বোন	তাখুক বুখুক
রাম ও সীতা	রাম সীতা	রামসীতা
কেনা ও বেচা	কেনা বেচা	পাইমুঙ ফালমুঙ
ভাল ও মন্দ	ভাল মন্দ	কাহামহাময়া।

দেখা যায় দু'টি বিশেষ্য বা দুটি বিশেষণ একত্র জুড়ে দ্বন্দ্বসমাস হয় বাংলায়। ককবরকেও হুবহু ঐ রকম হতে পারে।

৪.১১.২.২ ব্যাখ্যানমূলক সমাস (Determinative Compouds) ঃ এই প্রকারের সমাসে প্রথম শব্দটির দ্বিতীয় শব্দটিকে নির্দিষ্ট করে দেয় বা সীমাবদ্ধ করে দেয় অথবা তার বিশেষণ রূপে বসে। ব্যাখান মূলক সমাসের প্রধান প্রকার তিনটি।

(ক) তৎপুরুষ। এই সমাসে দ্বিতীয় পদটিই শ্রেষ্ঠ। প্রথম পদটি দ্বিতীয়টির অর্থকে সীমাবদ্ধ করে দেয়।

সমস্যমান পদ	সমস্ত পদ	ককবরক
রথকে দেখা	রথ দেখা	
ঘুণ দ্বারা ধরা	ঘুণ ধরা	গুণ চাজাক (ঘুণ দ্বারা ভুক্ত)

সমস্যমান পদ	সমস্ত পদ	ককবরক
ধানের জন্য জমি	ধান জমি	দান খেত
মৃত্যু হইতে ভয়	মৃত্যু ভয়	থুইনানি কিরিমা

সমস্যমান পদ	সমস্ত পদ	ককবরক
রাজার পুত্র	রাজপুত্র	রাজপুত্র
ঝুড়িতে ভরা	ঝুড়ি ভরা	উপরা কৌপলুঙ

(খ) কর্মধারায়। কর্মধারায় সমাসে দুটি পদেই প্রথমা বিভক্তি হয়। প্রথম পদটি সাধারণতঃ বিশেষণ হয়।

সমস্যমান পদ	সমস্ত পদ	ককবরক
নীল যে শাড়ী	নীল শাড়ী	রিগনাই কৌখরাঙ
কালো যে মেয়ে	কালো মেয়ে	কসমতি কসমসা
কাঁচা যেটি মিঠেও সেটি	কাঁচামিঠে	
বেগুন যেটি পোড়া	বেগুন পোড়া	ফানতক মজদেঙ (মজদেঙ-চাটনী)

(গ) দ্বিগু। প্রথম পদ সংখ্যা বাচক ও সমস্ত পদটির দ্বারা সমষ্টি বুঝায়।

সমস্যমান পদ	সমস্ত পদ	ককবরক
তিনটি মাথা	তেমাথা	-
সপ্ত (সাতটি) অহ (দিন)	সপ্তাহ	-
দুই+আনা+ঈ	দুয়ানী	-
চৌ+রাস্তা	চৌরাস্তা	-

৪.১১. ২.৩ বর্ণনামূলক সমাস। বহুব্রীহি।

এই সমাসে সমাসস্ত পদগুলির একটাও প্রধান নয়। পদগুলির মিলিত অর্থ অন্য কিছুকে বোঝায়।

সমস্যমান পদ	সমস্ত পদ	ককবরক
দশ আনন যার	দশানন-রাবন	-
পীত অম্বর যার	পীতাম্বর	-
চাঁদের মত মুখ যার	চাঁদমুখ	-

সমাস বিষয়ে ককবরকে তেমন কিছু ব্যবহার দেখা যায় না। সেটাই স্বাভাবিক। যে ভাষায় ক্রিয়ার কাল চিহ্ন প্রকরণ একেবারেই সরল, যে ভাষায় জটিল বাক্য গঠনের পদ্ধতিই নেই, সেই ভাষায় বিভিন্ন শব্দ একত্রিত হয়ে একটা নতুন শব্দ গড়ে তোলার উদাহরণ না থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু জীবন জটিল হলে ভাষা জটিল হতে বাধ্য। তাই ইদানিং ককবরকে সমাসবদ্ধ পদ গড়ে উঠছে।

যেমন—সামুঙসিত্রাতাঙনায়রগ-দুস্কৃতিকারিগণ।

সামুঙ (কাজ) + সিত্রা (কুৎসিৎ) + তাঙ (করা) + নায় (অক) + রগ (বহুবচনচিহ্ন)। তবে এমন শব্দের উদাহরণ এখনও কম।

৪.১২.০ বাক্য রীতি। এক বা একাধিক পদ মিলে যদি একটি সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে তবে সেই পদ বা পদসমষ্টিকে বাক্য বলে। বাক্যে অন্ততঃ দুটি পদ থাকা চাই-কর্তা ও ক্রিয়া। যেমন—

বাংলা	ককবরক
কর্তা ক্রিয়া	কর্তা ক্রিয়া
আমি যাব।	আঙ থাঙ্নাই।
এরা এসেছে।	বরগ ফাইখা।
পরেশ খেলে।	পরেশ থুঙ্গ।

কোনও কোনও সময় অবশ্য কর্তাটি প্রকট থাকে না, উহ্য থাকে। যেমন

বাংলা	ককবরক
যাও।	থাঙদি।
জিনিষটা এনো।	অ মানুই তুবুদি।
টাকা নিয়েছ?	রাঙ দা তৌলাঙখা?

সাধারণ নিত্য বর্তমান কালে 'হওয়া' বা 'থাকা' ক্রিয়া পদটি অনুক্ত থাকে।

বাংলা	ককবরক
রাম ভাল ছেলে।	রাম চেরাই কাহাম।
তারা দুই ভাই।	বরগ অখুক নাই।
বড় ভাই স্কুল শিক্ষক।	(তাখুক) অকরা উস্কুল মাষ্টার।
রাম এখনও ছাত্র।	রাম তাবুক ব সীরীঙনায়।

উপরের উদাহরণগুলিতে দেখা যায় যে বাংলা ও ককবরক্ বাক্যরীতি মোটামুটিভাবে একরকম।

৪.১২.১ পদক্রম।

বাংলা ও ককবরক উভয় ভাষাতেই পদক্রম একই প্রকার। প্রত্যেক বাক্যেই একটি উদ্দেশ্য ও একটি বিধেয় থাকে। কোথাও কোথাও যে কোনও একটা উহ্যও থাকতে পারে। উদ্দেশ্য আগে ও বিধেয় পরে বসে। উভয় ভাষাতেই পদক্রম কর্তা-কর্ম + ক্রিয়া। যেমন—

তখি বই পড়ে

তখি বই পড়িঅ

সিংহ মাংস খায়।

সিঙা বাহান চাঅ।

৪.১২.২ বাক্যের গঠনগত শ্রেণী বিভাগ। গঠন বিচারে বাক্য তিন প্রকারের হয়।

(১) সরল বাক্য।

(২) জটিল বাক্য।

(৩) যৌগিক বাক্য।

৪.১২.২.১ সরল বাক্য।

যে বাক্যে একটি মাত্র উদ্দেশ্য ও একটি মাত্র বিধেয় থাকে তাকে সরল বাক্য বলি। উদাহরণ নীচে দেওয়া গেল।

রবীন্দ্র বল খেলে।

রবীন্দ্র বল থুঙ্গ।

অনিমা বিকালে আসবে।

অনিমা সাইরিগ' ফাইনাই।

মেয়েটি গান গাইছে।

অ বীরাই রীচাবই তঙ্গ।

সরল বাক্য গঠনে বাংলা ও ককবরক নিয়ম প্রায় এক রকম। তবে বাংলায় বিশেষণটি সাধারণতঃ বিশেষ্যের আগে বসে। ককবরকে বিশেষণটি বিশেষ্যের পরে বসে।

লাথা কলক আন' রীদি।

(লাঠি লম্বা আমাকে দাও।)

লম্বা লাঠিটা আমাকে দাও।

বুবার কীচাক আঙ নানাই।

(ফুল লাল আমি নেব।)

লাল ফুলটা আমি নেব।

৪.১২.২.২ জটিল বাক্য।

কোনও কোনও বাক্যে একটি প্রধান সরল বাক্য এবং তার সঙ্গে এক বা একাধিক অপ্রধান খন্ড বাক্য থাকে। এই রকম বাক্যকে জটিল বাক্য বলে। অপ্রধান অংশটিতে কোনও কোনও সময় সমাপিকা ক্রিয়া থাকে আবার কোনও সময় থাকে না। যে সব বাক্যে কেবল প্রধান অংশে সমাপিকা ক্রিয়া আছে অপ্রধান অংশে নেই সেই রকম বাক্যের গঠন বাংলা ও ককবরকে একরকম।

সে এলে আমি যাব।

ব ফাইখে আঙ থাঙনাই।

তুমি গিয়ে কলমটা রামকে দিও।

নীঙ থাঙই অ কলম রামন' রীদি।

উপরের বাক্য দুটিতে একটি করেই সমাপিকা ক্রিয়া। সুতরাং এগুলিকে জটিল বাক্য না বলে সরল বাক্যই বলা উচিত।

যে বাক্যে প্রধান অংশে একটি সমাপিকা ক্রিয়া এবং অপ্রধান অংশ বা অংশগুলিতে একটি একটি সমাপিকা ক্রিয়া থাকে সেগুলিই সত্যিকারের জটিল বাক্য। এই রকম বাক্যে যে, যা, যদি, ইত্যাদি শব্দ অপরিহার্য্য। কিন্তু ককবরকে এই শব্দগুলি নেই। সুতরাং ককবরকে জটিল বাক্যও ছিল না। তবে বর্তমানে এই বাংলা শব্দগুলি দিয়েই ককবরকেও জটিল বাক্য গঠিত হয়।

যে লোকটি কাল এসেছিল সে আমার বন্ধু।

যে বরক মিয়া ফাইখা ব আনি কিচিঙ।

যা নেবে নাও।

যে তৌলাঙনানি মৌচুঙমা তৌলাঙদি।

(যা নিতে ইচ্ছা নাও।)

যদি সে আসে তবে আমি যাব।

যদি ব ফাইঅ ত আঙ খাঙনাই।

৪.১২.২.৩ যৌগিক বাক্য।

এক বা একাধিক সরল, জটিল বা সরল ও জটিল বাক্য একত্র হয়ে একটি যৌগিক বাক্য গঠন করে। বাংলা ও ককবরকের যৌগিক বাক্য গঠনের নিয়ম এক প্রকার।

রাম বনে যাবেন ও লক্ষণকে সঙ্গে নেবেন।

রাম বলঙ্গ থাঙনাই তাই লক্ষণন' লগি তৌলাঙনাই।

সে এলে তুমি যাবে কিন্তু সে পরে আসবে।

ব ফাইখে নৌঙ থাঙনাই ফিয়া ব উল' ফাইনাই।

ওরা ঝগড়া করে কিন্তু ওরা বন্ধু।

বরগ অআলাই ফান' ফিয়া বরগ কিচিঙ।

৪.১২.৩ বাক্যের অর্থগত শ্রেণী বিভাগ। অর্থ বিচারে বাক্য প্রধানতঃ চার প্রকারের হয়।

(ক) উক্তিমূলক।

(খ) জিজ্ঞাসা সূচক।

(গ) আজ্ঞা সূচক।

(ঘ) আবেগ সূচক।

৪.১২.৩.১ উক্তি মূলক বাক্য। যে বাক্যে কেবল কোন বক্তব্য রাখা হয় তাকে উক্তিমূলক বা নির্দেশমূলক বা নির্দেশসূচক বাক্য বলে। নির্দেশ সূচক বাক্য হ্যাঁ বোধক বা না বোধক হতে পারে।

আমি এখন যাই।

আঙ তাবুক থাঙগ।

গরু দুধ দেয়।

মুসুক দুধ রীঅ।

এগুলি অস্ত্যর্থক বা হ্যাঁ বোধক বাক্য। বাক্যকে না-বোধক বা নাস্ত্যর্থক করার সুস্পষ্ট নিয়ম থাকে প্রত্যেক ভাষায়। বাংলা ও ককবরকের না বোধক করার নিয়মগুলি নীচে আলোচনা করা গেল।

৪.১২.৩.১.১ না-বোধক করার নিয়ম।

ক) বাংলা

আমি গেলাম।	আমি গেলাম না।
আমি যাচ্ছিলাম।	আমি যাচ্ছিলাম না।
আমি যাই।	আমি যাই না।
আমি যাচ্ছি।	আমি যাচ্ছি না।
আমি যাব।	আমি যাব না।
আমি যেতে থাকব।	আমি যেতে থাকব না।
আমি যেতাম।	আমি যেতাম না।

বাংলা নির্দেশসূচক বাক্যে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালের সাধারণ ও ঘটমান প্রকারে ক্রিয়াপদের শেষে 'না' বসালেই অস্ত্যর্থক বাক্যটি নাস্ত্যর্থক হয়ে যায়। নিত্যবৃত্ত অতীতেও একই নিয়ম।

কিন্তু বর্তমান ও অতীতের পুরাঘটিত প্রকারে নিয়মটি একটু জটিল। এখানে ক্রিয়া পদটি সাধারণ বর্তমান এর রূপে এসে যায় এবং ক্রিয়াপদটির পরে 'নি' বসে। যেমন—

আমি খেয়েছি।	আমি খাইনি।
আমি খেয়েছিলাম।	আমি খাই নি।

(খ) ককবরক।

ককবরকে হাঁ-বোধক বাক্যকে না-বোধক করার সুন্দর ও সুস্পষ্ট নিয়ম আছে। নিয়মগুলি নীচে আলোচনা করা গেল।

(১) সাধারণ ও ঘটমান বর্তমান কালে হাঁ বোধক বাক্যে ক্রিয়ার শেষে কালচিহ্ন 'অ' বসে। বাক্যটি না-বোধক হলে ক্রিয়ার শেষে 'য়া' / ইয়া' বসে। কালচিহ্ন বসে না। ঘটমান বর্তমান কালের বাক্যও না বোধক-হলে সাধারণ বর্তমান কালের বাক্যের অনুরূপ হয়ে যায়।

আঙ থাঙগ	আমি যাই।
আঙ থাঙগই তঙগ	আমি যাচ্ছি।
আঙ থাঙয়া	আমি যাই না / যাচ্ছি না।

(২) সাধারণ ও ঘটমান অতীকালেরও না-বোধক বাক্যের রূপ অভিন্ন। ক্রিয়াপদের শেষে 'য়া/ ইয়া' যুক্ত হয়, তারপরে অতীকলের চিহ্ন 'খ' পরিবর্তিত হয় 'খো' রূপে বসে।

আঙ থাঙখা	-	আমি গেলাম।
আঙ থাঙগই তঙখা-		আমি যাচ্ছিলাম।
আঙ থাঙয়াখো	-	আমি গেলাম না / যাচ্ছিলাম না।

(৩) দূর অতীত কালের বাক্য না-বোধক হলে ক্রিয়ার সঙ্গে 'লিয়া' যুক্ত হয়। কালচিহ্ন বসে না।

আঙ থাঙমানি	-	আমি গিয়েছিলাম।
আঙ থাঙলিয়া	-	আমি যাইনি।

(৪) সাধারণ ভবিষ্যৎ কালের না-বোধক বাক্যে ক্রিয়ার শেষে গৌলাক / গ্লাক / লাক যুক্ত হয়। কাল চিহ্ন বসে না।

আঙ থাঙনাই	-	আমি যাব।
আঙ থাঙগ্লাক	-	আমি যাব না।

বর্তমান ও অতীকালের মতই ভবিষ্যৎ কালেও ঘটমান প্রকারে না-বোধক বাক্য হয় না।

৪.১২.৩.২ জিজ্ঞাসা সূচক বাক্য।

কিছু জানতে চাইলেই জিজ্ঞাসা করতে হয়। জিজ্ঞাসা করার নিয়ম আছে সব ভাষাতেই। জিজ্ঞাসা -সূচক বাক্যকে প্রশ্ন-বোধকও বলা হয়। ইংরেজী ব্যাকরণে প্রশ্নগুলিকে প্রধান দুই ভাগে ভাগ করা হয় (১) Wh-questions এবং (২) other questions. Who, what, when , which, why, ইত্যাদি শব্দ দিয়ে যে প্রশ্ন গঠিত হয় তাকে wh-question বলে। এই শব্দগুলির প্রথমে wh অক্ষর দুটি আছে। How কেও এই তালিকায় ধরা হয়।

ইংরেজী এই শব্দগুলির বাংলা প্রতিশব্দ কে, কি, কখন, কোন, কোথায়, কেন, ইত্যাদি। সুতরাং বাংলায় wh-questions গুলিকে আমরা ক-প্রশ্ন বলতে পারি। ককবরকে এই শব্দগুলির প্রতিশব্দ সাব,' তাম,' বাঁফুরু,' বাব,' তামনি নাগাই, ইত্যাদি। ককবরকে wh-questions গুলিকে ব-প্রশ্ন বলা হয়।

গঠনের বিচারে এই wh-প্রশ্ন অন্য প্রশ্ন থেকে পৃথক। সুতরাং আমরা এগুলিকে আলাদাই আলোচনা করব।

৪.১২.৩.২.১ ক-প্রশ্ন।

বাংলা ক-প্রশ্নগুলি দুই প্রকারের হয়—(১) যেগুলিতে ক্রিয়া পদটি উহ্য থাকে ও (২) যেগুলিতে ক্রিয়াপদটি প্রকট থাকে।

প্রথম প্রকারটিকে প্রশ্নকর্তা যা জানতে চায় তা বলে প্রশ্নসূচক শব্দটি বসিয়ে দেয়। বাক্যগুলিতে ক্রিয়াপদ উহ্য।

তোমার নাম কি?

আপনার বাড়ি কোথায়।

তোর বই কোনটা?

লোকটি কে?

ককবরকে এই বাক্যগুলি হুবহু বাংলার মত। বাংলা শব্দগুলির ককবরক প্রতিশব্দ বসিয়ে দিলেই ককবরক বাক্য হয়ে যায়।

তোমার নাম কি?	-	নিনি মুঙ তাম'?
আপনার বাড়ি কোথায়	-	নিনি নগ বৗর'?
তোর বই কোনটা?	-	নিনি বই বৗব'?
(এই) লোকটি কে?	-	অ বরক সাব'?

দ্বিতীয় প্রকারটিতে ক্রিয়া পদ প্রকট। বক্তা একটি নির্দেশ সূচক বাক্য তৈরি করে ক্রিয়া পদটির ঠিক আগে প্রশ্নসূচক শব্দটি বসিয়ে দেয়।

সে খায়.	সে কি খায়?
তুমি গিয়েছিলে।	তুমি কোথায় গিয়েছিলে?
রাম যাবে।	রাম কখন যাবে?
ওরা এসেছে।	ওরা কিভাবে এসেছে?
'রাবেয়া কাঁদছে।	রাবেয়া কেন কাঁদছে।

এই বাক্যগুলির ককবরক অনুবাদ নীচে দেওয়া গেল।

ব চাঅ।	ব তাম'চা?
নীঙ থাঙখা।	নীঙ বৗর' থাঙখা?

রাম থাঙনাই	রাম বৗফুরু থাঙনাই?
বরগ ফাইখা।	বরগ বাহাই ফাইখা?
রাবেয়া কাব'ই তঙ্গ।	রাবেয়া তামনি বাগৗই কাব'ই তঙ?

ককবরকেও বাংলার মত উক্তিমূলক বাক্যটির ক্রিয়া পদটির আগে প্রশ্নসূচক শব্দটি বসিয়ে দিলেই প্রশ্নবোধক বাক্য হয়ে যায়। একটি ব্যতিক্রম আছে। বাক্যটি বর্তমানকালে হলে ক্রিয়াপদের শেষে কালচিহ্ন 'অ' বসে না। বলা বাহুল্য এই ধরনের প্রশ্ন না বোধক হয় না সাধারণতঃ।

৪.১২.৩.২.২ অন্য প্রশ্ন।

ক-প্রশ্ন ছাড়া অন্য ধরণের প্রশ্ন আলোচনা করা যাক্। বাংলা ও ককবরক কিছু অন্য প্রশ্ন-বোধক বাক্য নীচে দেওয়া গেল।

যে বাজারে যায়।	ব হাতিঅ থাঙগ।
সে বাজারে যায়?	ব হাতিঅ থাদে থাঙ?
তখি খেলছে।	তখি থুঙগই তঙ্গ।
তখি খেলছে?	তখি থুঙগই তদে তঙ?
কাল কালু এসেছিল।	মিয়া কালু ফাইখা।
কাল কালু এসেছিল?	মিয়া কালু ফাইখা দে?
আমি বাজারে যাব।	আঙ হাতিঅ থাঙনাই।
আমি বাজারে যাব?	আঙ হাতিঅ থাঙনাই দে?

বাংলায় উক্তিমূলক ও প্রশ্নবোধক বাক্যে গঠনগত কোনও পার্থক্য নেই। বলার সময় দুই রকম বাক্যে দুই রকম সুর যোগ করা হয়। লেখার সময় নির্দেশসূচক বাক্যের শেষে দাঁড়ি ও প্রশ্নবোধক বাক্যের শেষে জিজ্ঞাসা চিহ্ন দেওয়া হয়।

ককবরক উক্তিমূলক ও প্রশ্নবোধক বাক্যের মধ্যে সামান্য পার্থক্য আছে।

সাধারণ বর্তমান কাল ছাড়া অন্য সমস্ত কালের বাক্যের বেলায় নির্দেশ-সূচক বাক্যটির শেষে 'দে' বলা হয়। (কোনও কোনও অঞ্চলে 'দে' না বলে 'দা' বলা হয়)। সাধারণ বর্তমানকালে বিষয়টা একটু জটিল। প্রথমতঃ 'দে' ক্রিয়াপদের আগে আসে। দ্বিতীয়ত ঃ 'দে'টি ক্রিয়াপদের প্রথমটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে আসে। তৃতীয়ত ঃ ক্রিয়াপদের শেষে কালচিহ্ন 'অ' বসে না। বিষয়টা পরিষ্কার করার জন্য নীচে আরও ক'টি উদাহরণ দেওয়া গেল।

নীঙ থাইচুক চাঅ।	নীঙ থাইচুক চাদে চা?
তুমি আম খাও।	তুমি আম খাও?
অ বীরাই কাব'।	অ বীরাই কাদে কাব্?
মেয়েটি কাঁদে।	মেয়েটি কাঁদে?
আচুই কথমা সাঅ।	আচুই কথমা সাদে সা?
ঠাকুরমা গল্প বলে।	ঠাকুরমা গল্প বলে?

এই অনুচ্ছেদে আমরা সবগুলি অস্ত্যর্থক প্রশ্নবোধক বাক্যের উদাহরণ দিয়েছি। এবার দেখা যাক এই বাক্যগুলি নাস্ত্যর্থক হলে কি হয়।

সে বাজারে যায় না।	ব হাতিঅ থাঙয়া।
সে বাজারে যায় না?	ব হাতিঅ থাঙয়া দে?
তখি খেলছে না।	তখি থুঙগই তঙয়া।
তখি খেলছে না?	তখি থুঙগই তঙয়া দে?
কাল কালু আসেনি।	মিয়া কালু ফাইয়াখো।
কাল কালু আসেনি?	মিয়া কালু ফাইয়া (খো) দে?
আমি বাজারে যাব না।	আঙ হাতিঅ থাঙগ্লাক।
আমি বাজারে যাব না?	আঙ হাতিঅ থাঙগ্লাক দে?

তুমি আম খাও না।	নীঙ থাইচুক চাইয়া।
তুমি আম খাও না?	নীঙ থাইচুক চাইয়া দে?

বাংলায় না-বোধক উক্তিমূলক ও প্রশ্ন বোধক বাক্যে গঠন গত কোনও পার্থক্য নেই। ককবরকে নির্দেশসূচক বাক্যটির শেষে 'দে' (অঞ্চল ভেদে 'দা') যোগ করলেই বাক্যটি প্রশ্ন বোধক হয়। সব কালে সব পুরুষে একই নিয়ম। তবে অধিকাংশ বক্তাই না-বোধক বাক্যে অতীতকালে চিহ্নটি ব্যবহার করে না।

৪.১২.৩.৩ আজ্ঞাসূচক বাক্য।

আদেশ, অনুরোধ, প্রার্থনা, ইত্যাদি প্রকাশ করতে আজ্ঞা বা অনুজ্ঞা সূচক বাক্য ব্যবহার করা হয়।

নির্দেশ সূচক বাক্য	আজ্ঞাসূচক বাক্য
তুমি যাও / কর।	তুমি যাও / কর।
তুই যাস / করিস	তুই যা /কর
আপনি / তিনি যান / করেন।	আপনি /তিনি যা (উ) ন / করুন।
সে যায় / করে।	সে যাক / করুক।
তুমি যাবে / করবে।	তুমি যাবে / করবে।
তুই যাবি / করবি।	তুই যাবি / করবি।
তিনি যাবেন / করবেন।	তিনি যাবেন / করবেন।
সে যাবে / করবে।	সে যাবে / করবে।

আজ্ঞাসূচক বাক্য কেবল বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালে হয়। তবে ভবিষ্যৎকালের উক্তিমূলক ও আজ্ঞাসূচক বাক্য দুটি গঠনগতভাবে অভিন্ন। সুতরাং ঐগুলি আমাদের আলোচনার বিষয় নয়। কর্তা 'তুমি' হলে বর্তমান কালেও বাক্য দুটি অভিন্নই থাকে।

'কর্তা, তিনি, তুই,সে' হলে উক্তিমূলক ও আজ্ঞাসূচক বাক্যে ক্রিয়া পৃথক চিহ্ন ধারণ করে।

কর্তা	উক্তিমূলক বাক্যে	আজ্ঞাসূচক বাক্যে
	ক্রিয়ার চিহ্ন	ক্রিয়ার চিহ্ন
তুই	স্ / ইস্ / আস্	আ
আপনি / তিনি	ন্ / আন্ / এন্	ন / উন
সে	এ	ক্ / উক্

এবার এই বাক্যগুলি ককবরকে হলে কি হয় দেখা যাক।

উক্তিমূলক বাক্য	আজ্ঞাসূচক বাক্য
নৌঙ থাঙগ (তুই / তুমি /আপনি যাস / যাও / যান।) ব থাঙগ (সে / তিনি / যায় / যান) নৌঙ থাঙনাই (তুই/ তুমি / আপনি যাবি / যাবে /যাবেন)	নৌঙ থাঙদি (তুই/তুমি/আপনি যা / যাও / যান।) ব থাঙথুন। (সে / তিনি যাক / যান) নৌঙ থাঙনাই (তুই/ তুমি / আপনি যাবি / যাবে /যাবেন)

দেখা যায় যে ককবরকে আজ্ঞাসূচক বাক্য গঠন করার নিয়মগুলি খুব সরল।

(১) ভবিষ্যৎ কালের নির্দেশ সূচক ও আজ্ঞা সূচক বাক্য অভিন্ন।

(২) বর্তমান কালে আজ্ঞাসূচক বাক্যের কর্তা মধ্যম পুরুষ হলে ক্রিয়াপদের শেষে 'দি' এবং কর্তা প্রথম পুরুষে হলে ক্রিয়ার শেষে 'থুন' যুক্ত হয়। কালচিহ্ন বসে না।

আজ্ঞা সূচক বাক্য না-বোধকও হয়। তবে না বোধক আজ্ঞা সূচক বাক্যে কর্তা সাধারণতঃ মধ্যম পুরুষ হয়, প্রথম পুরুষে এমন বাক্য বিরল।

তুই যা / কর।
তুমি যাও / কর।
আপনি যান / করুন। } নৌঙ থাঙদি /খ্লাইদি।

তুই যাস্নে / করিস্ নে।
তুমি যেও না/ করো না।
আপনি যাবেন না / করবেন না। } নৌঙ তা থাঙদি / খলাইদি।

বাংলায় হ্যাঁ-বোধক ও না-বোধক বাক্যের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য। ক্রিয়া পদটির রূপ বদলে যায় বিভিন্ন কর্তার পরিপ্রেক্ষিতে। এমন কি 'না' শব্দটিও কোথাও 'নে' হয়। কিন্তু ককবরকে নিয়মটি সরল। হ্যাঁ-বোধক আজ্ঞাসূচক বাক্যটিতে ক্রিয়াপদের আগে একটি 'তা' বললেই বাক্যটি না-বোধক হয়ে যায়।

৪.১২.৩.৪ আবেগ সূচক বাক্য।

কী সুন্দর জায়গা! আ! বাসুক নাইথক জাগা।

(আহ্ । কত সুন্দর জায়গা)

আহা কী দুঃখের কথা। উ বেলায় খা খামমানি কক।

(উহ্। অনেক হৃদয় পুড়ে যাওয়ার কথা)

ভগবান তোমার ভাল করুন। কাইথর নন' হামরি রীথুন। (ঈশ্বর তোমাকে কল্যাণ দিন)।

(৫) উপসংহার

পৃথিবীতে কয়েক হাজার ভাষা আছে। কোনও কোনও ভাষায় কয়েক কোটি লোক কথা বলে, আবার কোনও কোনওটায় হয়ত মাত্র কয়েকশ'। বহু ভাষা নিয়ে বহু গবেষক কাজ করেছেন, করছেন ও করবেন। কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোন গবেষণা হয়নি এমন একটি ভাষা পেয়ে যাওয়া একজন গবেষকের কাছে সৌভাগ্যের কথা। বর্তমান গবেষক সেই বিরল গবেষকদের একজন।

তুলনামূলক ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য আলোচিত ভাষাগুলির শিক্ষা ও শিক্ষনের পথ প্রশস্ত করা। বর্তমানে ককবরক ভাষাটি বিদ্যালয়ে পড়ানো হচ্ছে। কিন্তু শিক্ষকদের শিক্ষনের কোনও ব্যবস্থা এখনও হয়নি। এই বিষয়ে প্রধান অন্তরায় উপযুক্ত পুস্তকের অভাব। বর্তমান গবেষণা পুস্তকটি শিক্ষক শিক্ষণে সহায়ক হবে বলে বিশ্বাস। যদি এটি শিক্ষক শিক্ষণে ও ভবিষ্যৎ গবেষণায় দিগ দর্শক হয়ে উঠে তবেই আমার শ্রম সার্থক হল বলে মনে করব। এই পুস্তকটি একটি ব্যাকরণ রূপেও ব্যবহৃত হবে।

পরিশিষ্ট

।। ককবরক ভাষার লিখিত নমুনা ও তার বাংলা অনুবাদ।।

ককবরক

১। অযোধ্যানি রাজা দশরথ বুড়া ঔঙ্খা।

২। রাজ্য চালকনানি সামুঙ বাসা অকরা রামনি য়াগ য়াফারনাই।

৩। তারিখ ব ঠিক ঔঙখা রামন' রাজ্য চারৌনা বাগাই।

৪। রাজাখর' বরক বাংমানি, চাকলাই লিয়া- রামন' সিঙ্গাসন' আচুক রৌমানি নায়না বাগাই।

৫। আলকা রাজ্যনি রাজারগ তাই মুনি ঋষিরগ ফায়বাইখা।

৬। ফুঙ ফাইখে রাজ্য চারৌনানি জরাব' ঔঙবাইখা।

৭। বশিষ্ঠ মুনি সুমন্ত্রন', দাগিখা', 'থাঙদি সুমন্ত্র, অন্দর বিসিঙ্গ থাঙ্গই দশরতন' সাইসিদি জরাঔঙ্খা হিনই।'

বাংলা

১। অযোধ্যার রাজা দশরথ বৃদ্ধ হয়েছেন।

২। রাজ্য চালাবার কাজ পুত্র বড় (জ্যেষ্ঠ পুত্র) রামের হাতে দিবেন।

৩। তারিখ ও স্থির হয়েছে রামকে রাজ্য দিবার জন্য।

৪। রাজপ্রাসাদে লোক অনেক, জায়গা ছিল না—রামকে সিংহাসনে বসিয়ে দেওয়া দেখবার জন্য।

৫। অন্য রাজ্যের রাজাগণ এবং মুনি ঋষিগণ এসে পড়েছেন।

৬। প্রভাত আসলে রাজ্য দেবার সময়ও এসে গেল।

৭। বশিষ্ঠ মুনি সুমন্ত্রকে আদেশ দিলেন, 'যাও সুমন্ত্র, অন্তঃপুর মধ্যে গিয়ে দশরথরকে বলে দাও সময় হয়েছে বলে।'

স্বচ্ছন্দ বাংলা অনুবাদ

অযোধ্যার রাজা দশরথ বৃদ্ধ হয়েছেন। রাজ্য শাসনের ভার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামের হাতে ন্যস্ত করবেন। দিন তারিখ ঠিক হয়ে গেছে রামের রাজ্যাভিষেকের । রাজ প্রাসাদে অনেক লোক এসেছেন রাজ্যাভিষেক দেখতে-জায়গা নেই। অন্য রাজ্যের রাজাগণ ও মুনি ঋষিগণ এসেছেন। প্রভাত হল, রাজ্যাভিষেকের সময়ও হল। বশিষ্ঠ মুনি সুমন্ত্রকে বললেন, 'যাও সুমন্ত্র, অন্তঃপুরে গিয়ে দশরথকে বল সময় হয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জী

- ইসলাম, রফিকুল (১৯৭০)ঃ ভাষাতত্ত্ব, তৃতীয় সংস্করণ (১৯৮৬); নওরোজ সাহিত্য সংসদ, ৪৬ বাংলা বাজার, ঢাকা।
- চট্টোপাধ্যায়, সুনীতি কুমার (১৯৩৯) ঃ ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, রূপা পূর্ণমুদ্রণ (১৯৮৯), রূপা অ্যান্ড কোম্পানি, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা।
- চট্টোপাধ্যায়, সু হাস (১৯৭২) ঃ ত্রিপুরার কগবরক ভাষার লিখিতরূপে উত্তরণ, দি ইনসটিটিউট অব ল্যাংগুয়েজেজ অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েড লিঙ্গুইসটিকস, কলিকাতা।
- চৌধুরী, জামিল এবং অন্যান্যরা (১৯৮৮) ঃ ব্যাবহারিক বাংলা উচ্চারণ অভিধান, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ৫১, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।
- ঠাকুর, রবীন্দ্র নাথ (১২৯২ বাং) ঃ বাংলা ভাষা পরিচয়, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৪শ খন্ড, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ (১৯৬১), পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
- ঠাকুর, রবীন্দ্র নাথ (১৩৪৫ বাং) ঃ বাংলা উচ্চারণ, শব্দতত্ত্ব, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৪শ খন্ড।
- ঠাকুর, রাধামোহন দেববর্মন (১৮৯৯) ঃ ককবরক মা, তৃতীয় মুদ্রণ (১৯৬৬), শিক্ষা অধিকার, ত্রিপুরা।
- ত্রিবেদী, রামেন্দ্র সুন্দর (১৩১২) ঃ না, বাংলাভাষা (পৃ ৪২০-২৪), হুমায়ুন আজাদ (সম্পাদক) (১৯৮৪), বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
- দেববর্মা, দশরথ (১৯৭৭) ঃ কগবরক ছীরাঙ, দশরথ দেববর্মা, আগরতলা।
- ধর, প্রভাসচন্দ্র (১৯৮৩) ঃ ককবরক সীরাঙমা, গবেষণা অধিকার, উপজাতি ও তপশিলী জাতি কল্যাণ বিভাগ, ত্রিপুরা সরকার, আগরতলা।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ (১৯৯০) ঃ আপনি, তুমি, তুই, দেশ পত্রিকা (পৃঃ ৩০-৩৪), ৫৭ বর্ষ, ২১ সংখ্যা, ২৪ মার্চ ১৯৯০।
- বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ (১৯৭৫) ঃ বাংলা ভাষার আধুনিকত্ব ও ইতিকথা, পুথিপত্র, ৯, অ্যান্টনি বাগান লেন, কলিকাতা-৯।

- বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র (১৯১২ সংবৎ) ঃ বর্ণ পরিচয়, প্রথম ভাগ, বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ, তৃতীয় মুদ্রণ (১৯৭৪), পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, সাক্ষরতা প্রকাশন, কলিকাতা।
- সাগা, রেবতী মোহন (১৯৮১) ঃ বাংলা ভাষার সঙ্গে তুলনা প্রসঙ্গে কোচ-রাভা ভাষা, সুরভী প্রকাশনী, বিলাসীপাড়া, আসাম।
- হাই, মুহম্মদ আবদুল (১৯৬৪) ঃ ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব, ৩য় প্রকাশ (১৯৭৫), বর্ণ মিছিল, ঢাকা-১।
- Bhattacharya, P.C. (1977) : A Descriptive Analysis of the Boro Language; Deptt. of publication, Gauhati university.
- Chakraborti, Santosh (1983) :A Study of Tipra Language; Unpublished ph. D. dissertation, Burdwan University.
- Chakraborti, S. R. (1988) : Households and Household population by Language Mainly Spoken in the Householdpaper-1 of 1987; Controller of publications, Civil Lines, Delhi-110054.
- Chatterjee, Sunitikumar (1927) : Bengali Self-taught, Rupa & Co,Calcutta (1986).
- Chatterjee, Sunitikumar (1928) : A Bengali Phonetic Reader; Rupa & Co. Calcutta (1986)
- Chatterjee, Sunitikumar (1974) : A World Roman Script on the Basis of the International Phonetic Association Writings in World paper in Phonetics Fesetchrift for Dr. Onishi's Kitu; The Phonetic Association of Japan.
- Dev Barman, S.B.K.&Das A.R. (1989) : Search for an indigenous script: A Case for Kokbarak; in jonrnal of North East India Council for Social Science Research; (Vol-13, No-2) Shillong.
- Dhar, P.C (1977): The Segmental Phonemes of Tripura Bengali and Standard Indian English: A Con-trasive Study with Padagogical Implications; unpublished M.Litt, dissertation, Central Institute of English & Foreign Languages, Hyderabad.

- Dhar, P.C. (1984): The Phonology of Kokborak; in Educational Miscellany, Vol-XIII, July, 82 June 84; Directorate of Higher Education, Govt. of Tripura.
- Dhar, P.C (1986): Kakbarak: Problems and prospects; in Tripura Tribes; A Historical Survey; Rupali Book Centre, Agartala.
- Gleason Jr. H.A (1964): An Introduction to Descriptive Linguistics; Revised Edition (1973); Oxford & TBH Publishing Co. New Delhi.
- Goswami, Upendranath (1970): A Study on Kamrupi : A Dialect of Assamese; Department of Historical and Antiquarian studies, Assam.
- Grierson, G. A (1903) : Linguistic Survey of India, Motilal Bansrasidass, New Delhi, (1968 Reprint). Vol-V, Part-I, Vol-III, part II)
- Hall Jr. Robert. A (1964): Introductory Linguistics; 1st Indian Edition, Motilal Banarsidass, Delhi-7 (1969).
- Lorrain, Reginald Arthur (1951) : Grammar and Dictionary of the Lakher or Mara Language; Department of Historical and Antiquarian Studies,Govt. of Assam, Gauhati.
- Pai (Karapurkar). Pushpa (1976): Kokborok Grammar, Central Institute of Indian Languages, Mysore-6
- Potter, Simeon (1950): Our Language, Revised Edition, Penguin Books Ltd. Hermondsworth, Middlesex, England (1968 Reprint).
- West, F. (1975): The Way of Language: An Introduction, Harcourt Brace Jovenovich Inc. New York.

লাথা কলক আন' রীদি।
(লাঠি লম্বা আমাকে দাও।)
লম্বা লাঠিটা আমাকে দাও।
বুবার কীচাক আঙ নানাই।
(ফুল লাল আমি নেব)
লাল ফুলটা আমি নেব।

বর্তমান ঃ
(১) সাধারণ বা নিত্য বর্তমান ঃ আমি দেখি।
(২) ঘটমান বর্তমান ঃ আমি দেখছি।
(৩) পুরাঘটিত বর্তমান ঃ আমি দেখেছি।

ISBN - 978-81-932589-3-4